বাবুইয়ের অ্যাড্‌ভেঞ্চার

বয়সে ছোট হলে কি হবে, বাবুইয়ের মত পাকা মাথা ক'জনের হয়? অ্যাড্‌ভেঞ্চারের পর অ্যাড্‌ভেঞ্চারের সে এক বাহবা-পাওয়া নায়ক।

অনেক অনেক বুদ্ধি যাদের, বাবুই অবাককরা সব অ্যাড্‌ভেঞ্চারের খেলা দেখিয়ে তাদের একেবারে বোকা বানিয়ে দিতে পারে।

এই বইখানার ভেতর পাওয়া যাবে অ্যাড্‌ভেঞ্চারের রাজা বাবুইয়ের নতুন নতুন দিগ্বিজয়ের মন-মাতানো সব কাহিনী।

আমাদের প্রকাশনায়

লেখকের

বাবুইয়ের

অ্যাড্‌ভেঞ্চার

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী

প্রথম সংস্করণ: এক হাজার
ফাল্গুন, ১৩৭১ : ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৪

প্রকাশক :
ডি. মেহ্‌রা
রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২
৯৪ সাউথ মালাকা, এলাহাবাদ-১
১১ ওক্‌ লেন, ফোর্ট, বোম্বাই-১
১ আন্সারী রোড, দরিয়াগঞ্জ, দিল্লী-৬

মুদ্রক :
জয়ন্ত বাক্‌চি
পি. এম. বাক্‌চি অ্যাণ্ড কোম্পানী (প্রাঃ) লিঃ
১৯ গুলু ওস্তাগর লেন
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী :
নীতিশ মুখোপাধ্যায়

॥ পরিচয় ॥

সেদিন আমাদের পাশের বাড়িতে মস্ত এক বিয়ের ধূম গেল। আমাদের এ দু-বাড়ির মধ্যে বহুকালের পরিচয়। আমাদের বাড়িতে কাজ পড়লে ওরা নিজেদের লোকের মতো এসে খেটে দিয়ে যায়, আমরাও ওদের বেলা তাই করি। খুব ধূম করে বিয়ে হল কিনা, তাই একটা বাড়িতে কুলোয়নি ; আমাদের বাড়িটাও ওরা চেয়ে নিয়েছিল। ওদের বাড়িতে বিয়ের আসর হয়েছিল আর আমাদের বাড়িতে খাওয়া।

প্রথম পালা খাওয়া যখন হয়ে গেছে, আমি দৌড়ে পান নিয়ে যাচ্ছি, সেই সময় ছাদে একটা গোলমাল শুনলুম। গিয়ে দেখি আমাদের মেসোমশায় একজন বে-নেমন্তন্নি লোক ধরেছেন—একটি পনেরো-ষোলো বছরের ছেলে—দেখে বোঝবারই যো নেই যে সে এমন চুরি করে খেতে এসেছে !

তার একটা কান লাল টক্‌টকে হয়ে উঠেছে, বুঝলুম সেটা মেসোমশায়ের আশীর্বাদ। কিন্তু আশ্চর্য এই যে ছেলেটির মুখের ভাব দেখে বোঝবারই যো নেই যে সে বিন্দুমাত্র লজ্জিত হয়েছে। আচ্ছা বেহায়া ছেলে তো ! ভাবলুম, মার-ধোরে কিছু হবে না—একে একটু শিক্ষা দিতে হবে। এই ভেবে ভিড় ঠেলে এগিয়ে গিয়ে আমি বললুম, মেসোমশায়, একে আমার কাছে ছেড়ে দিন ; আমি এর ব্যবস্থা করছি। বলে ছেলেটিকে সঙ্গে করে আমার ঘরে গিয়ে ঢুকলুম।

খাটের উপর তাকে বসতে বলে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলুম—তুমি কি বাড়িতে খেতে পাও না ?

ছেলেটি বললে—তা পাবো না কেন ?

আমি বললুম—এখানে খেতে এসেছিলে কেন ?

ছেলেটি হাসতে হাসতে বললে—সে আপনারা বুঝতে পারবেন না।

তার হাসি দেখে আমার রাগ হল। কড়া করে বললুম—লোভ ?

ছেলেটি সংক্ষেপে বলল—না।

কেন ?

ছেলেটি বললে—দেখুন, আমি যে ধরা পড়েছি, সে আমি ইচ্ছে করে ধরা দিয়েছি বলে। নইলে এই ভদ্র-পোশাকে আমাকে হঠাৎ চোর বলে ধরতে আপনাদের সাহসই হত না।

আমি বললুম কখ্‌খনো নয়। মেসোমশায় বিয়ে বাড়িতে তোমার মতো অমন ঢের লোক ধরেছেন। এই কাজ করে তিনি বুড়ো হয়ে গেলেন। তুমি তাঁর চোখকে ফাঁকি দিয়ে পালাবে ?

ছেলেটি বললে—বিশ্বাস না হয়, সেই টাক-মাথা ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করুন—ঐ যে যিনি ত-ত-ত-ত করে কথা বলেন।

আমি বললুম—বুঝেছি। টেকো আর তোতলা তো ? রাধাবিনোদ-বাবু, তাঁর সঙ্গে তোমার কী ?

ছেলেটি বললে—আমার কিছু না। পংক্তি যখন পড়ল ঐ রাধাবিনোদবাবু না কি বললেন, তাঁর পাশেই আমি বসে পড়লুম। আপনার মেসোমশায় বহুবার আমাদের পংক্তির সামনে দিয়ে চলে গেলেন, আমাকে দু'বার জিজ্ঞেস পর্যন্ত করে গেলেন যে আমার কী চাই ? একবারও আমায় চোর বলে সন্দেহ করলেন না। আমি দেখলুম, তবে তো সব মাটি হয়। খাওয়া যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে আমি রাধাবিনোদবাবুকে এক ঠেলা দিয়ে বললুম—হ্যাঁ মশায়, বরের নামটি জানা আছে তো ? রাধাবিনোদবাবু কটমট করে আমার দিকে তাকালেন। খানিক চুপ করে থেকে বলে উঠলেন—তো—তো—তো। আমি বললুম—কী, তরুণ ? তিনি বললেন—তো-তো-তোমার কোথায় থাকা হয় ? আমি চোখ টিপে বললুম—সে আর জেনে কী হবে ? আপনারই মতো এখানে ঢুকে পড়েছি।

আমি তাজ্জব হয়ে বললুম—এই কথা বললে তুমি রাধাবিনোদ-বাবুকে ?

ছেলেটি বললে—তা বললুম। কারণ ভদ্রলোক আমার পাশে বসে যা খেলেন, দেখবার মতো। আপনাদের কোনো আত্মীয় বুঝি ? একবার ডেকে জিজ্ঞেস করুন না।

আমি বললুম—রাধাবিনোদবাবুকে জিজ্ঞেস করে কোন লাভ নেই। ানি এমন তোতলাবেন, কিচ্ছু বোঝা যাবে না। তুমিই বলো।

ছেলেটি বললে—আমি তখন রাধাবিনোদবাবুকে জিজ্ঞেস করলুম, নের বাবার নামটি যদি জানেন তো বলুন না। তিনি মহা চটে লেন— তু— তু— তুমি কার বি— বি— বিয়েতে নেমন্‌-ত— — ত— ত খেতে এসেছ হে ছোকরা? আমি যেন ভারি ভয় পেয়ে ছি এই ভাব দেখিয়ে বললুম—মাপ করবেন, খাওয়া দাওয়া তো হয়ে গছে, এখন আসুন না কোনরকমে সরে পড়ি। উনি আর কিছু ললেন না, চুপিচুপি আপনার মেসোমশায়কে ডেকে নিয়ে এলেন। ারপর কী হয়েছে আপনি তো দেখেছেন।

আমি বললুম—ধরা পড়ে অনেকেই অনেক রকম কথা বলে। আমি তামায় সহজে ছাড়ছিনে। তোমার নাম, তোমার ঠিকানা কি তাই ল। আমি সব খোঁজ চাই।

ছেলেটি তার নাম, তার বাবার নাম, তাদের বাড়ির ঠিকানা, সব লে গেল। বলল—এখানে হ্যাংলার মতো খেতে আসিনি।

আমি বললুম—তবে তুমি কী করতে এসেছ?

সে বললে—অ্যাড্‌ভেঞ্চার করতে।

আমি বললুম—তার মানে? কানমলা খাওয়া তোমার অ্যাড্‌-ভেঞ্চার না কি?

সে বললে—নয়? এই তো মজা। সখ করে চুরি করলুম, ইচ্ছে করে ধরা দিলুম, লোকে সত্যিকারের চোর বলে ভুল করল, একি একটা কম অ্যাড্‌ভেঞ্চার?

আমি ভাবলুম, ছেলেটার মাথায় কিছু গোল আছে। বললুম—চলো, আমাকে তোমাদের বাড়িতে নিয়ে চল।

তাদের বাড়িতে পৌঁছে নীচে বসবার ঘরে ঢুকলুম। সেখানে তার বাবা বসে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে পরিচয় হতে তাঁকে ব্যাপারটা আগাগোড়া খুলে বললুম।

প্রথমটা তিনি ভালো বুঝতে পারলেন না। তারপর অ্যাড্‌-ভেঞ্চারের কথাটা বলতেই হো হো করে হেসে উঠলেন। হাসি থামতে

তাঁর ছেলেকে কাছে ডেকে বললেন—ছিঃ বাবুই, তোমার অ্যাড্‌ভেঞ্চারের ফলে অচেনা ভদ্রলোকেরা এমন ভাবে উদ্‌ব্যস্ত হলেন, এ তোমার ভারি অন্যায়। তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন—ওকে আপনি চেনেন না—ওর ঐ অ্যাড্‌ভেঞ্চার করা এক বাতিক। ছেলেবেলা থেকে এই নিয়ে ওর সঙ্গে আমরা আর পারলুম না। কিছু মনে করবেন না।

শুনে আমার ভারি আশ্চর্য লাগল। বাবুইয়ের সঙ্গে ঝগড়া মিটিয়ে ভাব করে ফেললুম। সেই থেকে তার সঙ্গে আমার খুব ভাব। বাবুইয়ের ছেলেবেলাকার নানা অ্যাড্‌ভেঞ্চারের গল্প সে আমার কাছে করেছে। তা যেমন আশ্চর্য তেমনি মজার। তারই মুখ থেকে যেমন শুনেছিলুম তার অ্যাড্‌ভেঞ্চারের কাহিনী, এইবার তোমাদের শোনাচ্ছি।

॥ ১ ॥

শনিবারের ছুটি হয়ে গেছে। ইস্কুল থেকে ফিরে এসে বাড়ির ছাদে পাঁচিলের ছায়ায় একলা বসে কত কী ভাবছিলুম। বৈশাখ মাস, সারা ছাদ রোদে ঝাঁ ঝাঁ করছে। আগুন হাওয়ায় গা-মুখ যেন পুড়ে যায়। গাছ-পালা, কাক-পক্ষী পর্যন্ত সব নিঃঝুম। ঘর অন্ধকার করে পাখা চালিয়ে বসে-শুয়ে আছে সবাই; কিন্তু আমার ও-সব ভালো লাগে না। এই জায়গাটিই আমার সবচেয়ে পছন্দ—গরম-ই হোক আর যা-ই হোক। হাতে বাংলা খবরের কাগজ "আজব-তত্ত্ব" নিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে ছিলুম। এই খবরের কাগজটি আমার রোজই কিনে পড়া চাই—এক দিনও বাদ গেলে চলে না। বাবা বলতেন, হ্যাঁরে, পৃথিবীতে এত বই থাকতে তোর ঐ কাগজটার উপরই এত ঝোঁক কেন? আমি বলতুম—এতে যেমন মজার মজার খবর বার হয়, অন্য কোনো বইয়ে, কোনো কাগজে তা পাবার যো নেই। কে উত্তর-মেরুতে যাত্রা করেছে, কে মরুভূমি পার হচ্ছে, কারা প্রশান্ত মহাসাগরে সাঁতার দিচ্ছে, কোন দেশের গাছে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালে আর পিঠ ছাড়ানো যায় না—রক্ত শুষে গাছ মানুষকেই খেয়ে ফেলে, কোথায় রক্তের মতো লাল বৃষ্টি হয়েছে, কোথায় হলুদ-রঙা বরফ পড়েছে, কোথায় পাঁচ-মাথাওয়ালা বাছুর জন্মেছে, কোন দেশে এক ছেলে জন্মেছে যে সাত বছর বয়েসেই এমন শক্ত শক্ত অঙ্ক কষছে যে বড়রাও তা পারে না। এই সব তাজ্জব খবর পড়ে আমি মুগ্ধ হয়ে যেতুম। আমার মনে হত, আমিই বা কবে এমন আশ্চর্য আশ্চর্য কাণ্ড ঘটিয়ে আমারই মতো পাঠকদের তাক লাগিয়ে দিতে পারব?

খবরের কাগজে এইমাত্র পড়েছি, একদল সাহেব হিমালয়ের এভারেস্ট পর্বতের চূড়োয় ওঠবার জন্যে বেরিয়ে পড়েছেন। অতি দুরূহ পর্বতারোহণ! যেমন ঠাণ্ডা, তেমনি চোখ-আঁধার করা বরফের ঝড় আর কুয়াসা, আর থেকে থেকে বড় বড় ধ্বস! আজ অবধি কেউই এ পাহাড়ের চূড়োকে জয় করতে পারেনি—যে-ই চেষ্টা করেছে সে-ই মারা পড়েছে। যাত্রার শুরুতে ভক্তের দল এসে সাহেবদের গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে গেছে। কুলি-মজুর-তাঁবু-দড়ি-কাঁটা-জুতো-গাঁইতি-ভোট-

কম্বল-খাবার-রসদ নিয়ে সাহেবরা বেরিয়ে পড়েছেন হিমালয়ের পথে। যাবার আগে বলে গেছেন—এভারেস্ট জয় না করে আমরা ফিরব না। খবরটা পড়ে মনে মনে আমি চঞ্চল হয়ে উঠলুম। নিজের মনেই একবার বলে উঠলুম—একটা কিছু অ্যাড্‌ভেঞ্চার না করলে আর চলছে না দেখছি।

একটা লাল ঘুড়ি আমার মাথার কাছে ফর্‌র্‌ ফর্‌র্‌ করে উড়ছিল। এই দুপুর রোদে কে ওড়াচ্ছে কে জানে? মনে মনে মতলব আঁটছিলুম, প্রকাণ্ড একখানা ঘুড়ি তৈরি করব। ঘুড়ি করে, যেদিন ঝোড়ো বাতাস বইবে মোটা দড়ি বেঁধে তাকে উড়িয়ে দড়ি ধরে ঝুলে পড়ব। তারপর ঘুড়ি আমায় যেখানে টেনে নিয়ে যায়! এই ফন্দিটা মাথায় আসছিল, এমন সময় ছাদের কোণায় কিঁচ্‌ করে একটা আওয়াজ।

চেয়ে দেখি একটা ছোট্ট বাঁদরের ছানা সামনের দেবদারু গাছ থেকে লাফিয়ে আমাদের ছাদের পাঁচিলের উপর বসে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। এমন কচি বাচ্চাটা যে দেখেই ধরতে ইচ্ছে করে। ভাবলুম এটাকে ধরে পোষ মানালে চমৎকার হয়। অ্যাড্‌ভেঞ্চারে যখন বেরোবো এটাকে সঙ্গী করে নিতে পারব। পৃথিবী-বিখ্যাত পর্যটকদের অনেকেরই সঙ্গে কুকুর, বেড়াল, কাকাতুয়া সঙ্গী থাকত। বাঁদর কারো ছিল বলে মনে পড়ে না। এই না ভেবে আমি দৌড়ে নীচে ছুটলুম একটা চাদর নিয়ে আসবার জন্যে। চাদর চাপা দিয়ে বাচ্চাটাকে ধরব। বারান্দায় একটা বিছানার চাদর শুকোচ্ছিল; সেটা টেনে নিয়ে ছাদে গিয়ে দেখি বাঁদরটা আর নেই। নীচের দিকে উঁকি মেরে দেখি কলতলার চৌবাচ্চার উপর বাঁদরের ছানাটা বসে রয়েছে, তার হাতে একটা টিনের বাক্স। ভারি মনোযোগ দিয়ে বাক্সটাকে দেখছে। চাদর-হাতে দৌড় দিলুম কলতলায়। গিয়ে দেখি বাঁদরের বগলে একটা বিস্কুটের বাক্স। আমার মনে হঠাৎ ভারি আনন্দ হল। ঐ বিস্কুটের টিনটার উপর আমার অনেক দিন থেকে বড় লোভ। কিন্তু বাবা যে ওটাকে কোথায় লুকিয়ে রাখতেন কোনোমতেই খুঁজে পাওয়া যেত না। মাঝে মাঝে ঐ বাক্স থেকে বাবা একটু করে বিস্কুট ভেঙে আমায় খেতে দিতেন। সে যে কী চমৎকার খেতে কী বলব! ঐটুকুতে আমার লোভ আরো বেড়েই

যেত। আশ মিটতো না, মুখে লেগে থাকত বিস্কুটের স্বাদ, মাথার মধ্যে ঘুরত বিস্কুটের কল্পনা, কিন্তু বাবা চলে গেলে হাজার খুঁজেও কিছুতেই আমি বাক্সটা বার করতে পারতুম না। এমন একটা লোভনীয় বাক্স যে খুঁজে বার করেছে সে-ই যদি আমার অ্যাড্‌ভেঞ্চারের সঙ্গী না হবে তো হবে কে? আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলুম।

বিস্কুট-সমেত বাঁদরটাকে ধরবার জন্যে দিলুম ছুট। আমি আসতেই বাঁদর-বাচ্চাটা পাঁচিল টপকে দিলে পিঠটান—কিন্তু পালাবার সময় বেচারার হাত থেকে বিস্কুটের টিনটা কলতলার শানের উপর পড়ে গেল। তৎক্ষণাৎ সেটাকে আমি আত্মসাৎ করলুম। একবার চারিদিকে চেয়ে দেখে নিলুম বাড়ির কেউ দেখলেন কিনা। কিন্তু কাউকেই চোখে পড়ল না। বিস্কুটের বাক্সটা চাদরে বেশ করে জড়িয়ে ধীর গতিতে বাড়ির দরজা পেরিয়ে রাস্তায় এসে পড়লুম। বাঁদরটাকে পাওয়া গেল না।

বুঝলুম বাঁদরটা হাতছাড়া হয়ে গেছে। ওকে আর পাওয়া যাবে না—যাবার আগে আমায় উপহারটা দিয়ে গেল। যাই হোক্ রাস্তায় যখন বেরিয়েই পড়েছি, ভাবলুম, তখন আর দেরি কেন, অ্যাড্‌ভেঞ্চারই শুরু করে দেওয়া যাক। অ্যাড্‌ভেঞ্চার মানে অজানা কোথাও যাওয়া। কারাকোরাম বা আরাবল্লী না হোক যে কোনো অজানা অচেনা জায়গা হলেই হবে। আমাদের বাড়ির সকলে গরমে ঘরদোর বন্ধ করে শুয়ে আছেন, কাজেই কেউ আমায় দেখতে পেলেন না। রাস্তা ধরে হন হন করে আমি একদিকে চলা শুরু করে দিলুম। পকেটে হাত দিয়ে দেখলুম আমার জন্মদিনে পাওয়া দশটাকার নোটটা তখনও রয়েছে। ওটা অনেক টাকা। দূরে যাবার পক্ষে যথেষ্ট!

চলতে-চলতে ভাবতে লাগলুম—কোথায় যাওয়া যায়? একবার রাঁচিতে যখন বেড়াতে গিয়েছিলুম রাত্তির বেলা টাটানগর স্টেশানে আমাদের ট্রেন দাঁড়িয়েছিল। গাড়ির অন্ধকারের মধ্যে থেকে উঁকি মেরে দেখেছিলুম দূরের আকাশটা যেন আগুনের হলকায় টক্‌টকে লাল হয়ে রয়েছে আর মাটির উপর হাজার হাজার ইলেকট্রিকের আলো। অমন দৃশ্য কখনও চোখে দেখিনি—অপূর্ব লেগেছিল। বাবাকে ডেকে জিজ্ঞেস করেছিলুম—ও আলোগুলো কিসের? বাবা

তখন অঘোরে ঘুমোচ্ছিলেন—আমার কথার জবাব দেননি। আমি ভেবেছিলুম যখন বড় হবো, একবার টাটানগরে গিয়ে ঐ আলোর রাজ্যটা দেখে আসব। রাঁচিতে পৌঁছেও আমার মাঝে মাঝে মন খারাপ হয়ে যেত, মনে হত—দূর, এ আবার একটা দেশ! এর চেয়ে টাটানগরের আলোর রাজ্যটায় যেতে পারলে অনেক মজা হত!

আজ সেই টাটানগরের কথা হঠাৎ মনে পড়ে যেতে আমি ঠিক করে ফেললুম—ঐ খানেই যেতে হবে।

স্টেশানে পৌঁছে দেখলুম চারিদিকে ভিড়, গোলমাল, কুলিমজুর ছুটছে, জায়গায় জায়গায় ছেলেমেয়ে-বৌ নিয়ে যাত্রীরা উবু হয়ে বসে রয়েছে, চা-ওয়ালা আর ভাজি-ওয়ালারা যাওয়া-আসা করছে। বইয়ের দোকানে টাইম-টেব্‌ল্ পাওয়া যায় জানতুম—সেখান থেকে একটা টাইম-টেব্‌ল্ কিনলুম। টাইম-টেব্‌ল্ দেখতে জানি না—একজন অচেনা ভদ্রলোককে ধরলুম। হন্ হন্ করে চলে যাচ্ছিলেন, আমার ডাকে থমকে দাঁড়ালেন।

—ও মশায়, এইটে দেখে একটু বলে দেবেন, টাটানগরের গাড়িটা কখন ছাড়ে?

তিনি কেমন যেন সন্দেহের চোখে আমার দিকে তাকালেন। বললেন—কোথায় যাবে?

—টাটানগর।

—সঙ্গে কেউ নেই?

—না।

কী ভেবে জানি না, ভদ্রলোক আর কথা বাড়ালেন না, আমার হাত থেকে টাইম-টেব্‌ল্‌টা নিয়ে থামের গায়ে যে বেঞ্চিটা ছিল তাইতে বসলেন, চোখে চশমা পরলেন, আমাকে পাশে বসতে বললেন, তারপর আমি বসলে প্রথমেই আমায় শিখিয়ে দিলেন, কেমন করে স্টেশানের নামের সূচী দেখে পাতা বার করতে হয়। কোন্ কোন্ ট্রেন সেই স্টেশানে ক'টার সময় পৌঁছবে এবং ক'টার সময় সেখান থেকে ছাড়বে তা কী করে দেখতে হয় শিখিয়ে দিলেন। আমি অতি সহজেই শিখে নিলুম বিদ্যেটা। তারপর নিজের চেষ্টাতেই বার করে ফেললুম,

তিন ঘণ্টা পরে ৮নং প্ল্যাটফরম থেকে টাটানগরের একখানা গাড়ি ছাড়ছে।

ভদ্রলোক বিদায় হলেন। আমি তখন টিকিটের চেষ্টায় উঠলুম। সারি সারি অনেকগুলি খুপরি জানলা। তার প্রথম জানলার মধ্যে হাত বাড়িয়ে দশটাকার নোটটা এগিয়ে দিয়ে বললুম—একখানা টাটানগরের টিকিট দেবেন?

—সাত নম্বর জানলায় যাও।

সরে এলুম। বুঝলুম এই রকম করেই এখানে টিকিট বিক্রি হয় তাহলে—সব জানলায় সব জায়গার টিকিট পাওয়া যায় না।

সাত নম্বর জানলায় গিয়ে টাটানগরের টিকিট কিনলুম। তারপর একটা বেঞ্চিতে গিয়ে বসলুম।

হাতে এখনও তিন ঘণ্টা সময়। তিন ঘণ্টা কাটানো যায় কী করে? বিস্কুটের বাক্সটা খুলে ফেললুম। একে হাতে কোন কাজ নেই তার উপর নাকের সামনে আমার অতদিনের আশা করা অমন লোভনীয় বিস্কুট—একটার পব একটা মুখে উঠতে লাগল। প্রথমে ভেবেছিলুম, ক্রীম-দেওয়াগুলো বাঁচিয়ে রাখবো, পরে বেছে বেছে চেখে চেখে খাবো সেগুলোকে। কিন্তু একটার একটুকরো চেখে দেখলুম। জিভে পড়তেই মিলিয়ে গেল। এত ভালো লাগল যে গোটাটা শেষ হতে দেরি হল না। তারপর দ্বিতীয় একটা, তাবপর আরও একটা, শেষকালে সব বিস্কুট শেষ হয়ে গেল। আমি তখন বিস্কুটের টিনটা ঝেড়ে কল থেকে এক পেট জল খেয়ে টিনটা চাদরে মুড়ে আবার বেঞ্চিতে এসে বসলুম।

বেঞ্চির এক ভদ্রলোক বোধহয় এতক্ষণ আমার লোভীর মতো বিস্কুট খাওয়া লক্ষ্য করছিলেন; তিনি বললেন—বিস্কুট খেতে তোমার খুব ভাল লাগে বুঝি?

আমি একটু লজ্জা পেয়ে গেলুম, তারপর সামলে নিয়ে বললুম—লাগবে না? ডিক্‌সনের মিক্‌স্‌ড্‌ বিস্কুটের কি কোনো তুলনা হয়?

তিনি বললেন— কোনো তুলনা হয় না। আমি জানি। আমিও ওই বিস্কুট খাই। চমৎকার খেতে।

—আপনি বিস্কুট খান? ক-টা করে খান একদিনে?

—ওঃ, তা কি গুণেছি ? মুঠো মুঠো খাই !

—মুঠো মুঠো ? ঈস্ আমি যদি পেতুম ! আমাকে বাবা একটার বেশী কখনও দেন না। কালে ভদ্রে দুটো। আজই সবে···

—আজই কী ?

—আজকে মানে আজ এই বিস্কুটের বাক্সটা পেলুম—মানে আমার হাতে এল—মানে এটা আমার।

—বুঝলুম। মানে ওটা তোমাব বাবা তোমায় দেননি। তোমার হাতে এসে গেছে।

আমি নিজেকে সামলে নিলুম। বেশ নির্বিকার ভাবে বললুম—একটা বাঁদরের বাচ্চা এটা আমায় পাইয়ে দিয়েছে।

—বাঁদরের বাচ্ছা ?

—হ্যাঁ, বাঁদরের বাচ্চা। কোথা থেকে টেনে বাব করল জানি না—বাবা তো আমাদের চোখেব আড়ালে ওটাকে লুকিয়েই বাখেন।

—তারপর ?

—তারপর বাঁদরেব হাত থেকে আমার হাতে এল। বাঁদরটাকে ধরবো ভেবেছিলুম, পাবলুম না, টিনটা ফেলে দিয়ে পালিয়ে গেল।

—বাঁদরটাকে ধরবে ভেবেছিলে ? কেন ? পুষবে বলে ?

—হ্যাঁ তাই। ভেবেছিলুম পুষে আমার অ্যাড্‌ভেঞ্চারের সঙ্গী করে নেব।

—অ্যাড্‌ভেঞ্চারের ?

—হ্যাঁ অ্যাড্‌ভেঞ্চাবের। আমি যে অ্যাড্‌ভেঞ্চাবে বেরিয়েছি।

—অ্যাড্‌ভেঞ্চারে বেরিয়েছ ? তার মানে বাড়ি থেকে না বলে পালিয়েছ ?

—তাই।

—বেশ ছোকরা তো হে তুমি ! আর আমাকে সেই কথা বলে দিলে ?

—ক্ষতি কি ?

—আমি যদি এখন তোমায় পুলিসের হাতে ধরিয়ে দিই ?

—দিলেই বা !

—দিলেই বা? তাহলে আর তোমার অ্যাড্‌ভেঞ্চার হবে কই?

—ওইটেই অ্যাড্‌ভেঞ্চার হবে—পুলিসে ধরবে।

—ওঃ বুঝলুম। ধরা পড়ে গেলেও অ্যাড্‌ভেঞ্চার, পালিয়ে গেলেও অ্যাড্‌ভেঞ্চার। আচ্ছা, তোমরা কখনও ডিক্‌সনের বিস্কুটের টিনে প্রাইজ পেয়েছ?

—প্রাইজ? সে আবার কী?

—জানো না? বার করো তোমার টিন। দেখিয়ে দিই।

আমি চাদর খুলে আমার টিনটা তাঁর হাতে দিতে তিনি ঢাকাটা তুলে বললেন—এই দেখ।

আমি দেখলুম—টিনের গায়ে একটা নম্বর খোদা রয়েছে।

তিনি বললেন—প্রত্যেক টিনই নম্বর করা। ডিক্‌সন্ কোম্পানী প্রতি তিন মাস অন্তর এর থেকে একটা নম্বর লটারি করে টেনে তোলে। বিলিতি কাগজে সেটা ছাপিয়ে দেয়। যার টিনের নম্বর মিলে যায় সে টিন পাঠিয়ে এক-শো-টাকা পেতে পারে। তোমার বাবা নিশ্চয় জানেন এ-সব।

—জানেন কিনা জানি না। তবে দেখেছি বটে শিশি-বোতল-ওয়ালার কাছে মা পুরানো বিস্কুটের টিন বিক্রি করতে চাইলে বাবা সহজে দিতে চান না।

সেই সময় একজন এসে ভদ্রলোককে ডাকলেন—ওঠো ভাই ট্রেন ইন্ করবে এখুনি।

শুনে ভদ্রলোক উঠে পড়লেন। বুঝলুম তাঁর আর আমাকে পুলিসে ধরিয়ে দেবার উৎসাহ নেই। যাবার সময় শুধু বলে গেলেন—যেখানেই যাও, সাবধানে থেকো।

ভদ্রলোক চলে যাবার খানিক পরে উঠলুম আমি। ৮নং প্ল্যাটফরমে টাটানগরের গাড়ি দাঁড়িয়ে। চাদরের পুঁটলিটা বগলে করে একটা থার্ড ক্লাস কামরায় জায়গা নিয়ে বসে পড়লুম।

গাড়ি ছেড়ে দিল।

আমার চোখের সামনে ধীরে ধীরে স্টেশানের দৃশ্য, তারপর শহরের দৃশ্য মুছে গেল। তারপর কারখানা, শেষে মাঠ আর গাছে ঢাকা গ্রাম,

পাড়-উঁচু পুকুর, ডোবা। সব দেখে মনে হতে লাগল, স্বেন্ হেডিন্ কি কলম্বাসের মতো সত্যিই আমি অ্যাড্‌ভেঞ্চারে বেরিয়েছি।

ভোর চারটের সময় টাটানগরে পৌঁছবার কথা। অন্ধকার হয়ে আসতেই আমার পুঁটলিটা বালিস করে পা গুটিয়ে কাঠের বেঞ্চিতে শুয়ে পড়লুম।

ট্রেনে বিশেষ ভিড় ছিল না। একে একে সবাই শুয়ে পড়ল। কখন চোখ ঢুলে এসেছে জানি না—ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। হঠাৎ একটা ঝাঁকানিতে ঘুম ভাঙতেই দেখি একটা স্টেশানে এসে গাড়ি দাঁড়াচ্ছে। চাকার ক্যাঁচ্ কোঁচ্ শব্দ কেমন যেন অদ্ভুত লাগছে। গভীর রাত। মনে হচ্ছে, কোথায় এলুম? বোধহয় স্বপ্ন দেখছিলুম মামার বাড়ির ছাদে মামাতো ভাইবোনদের সঙ্গে ব্যাড্‌মিণ্টন খেলছি। আর নীচের রাস্তা দিয়ে ঘটাং ঘটাং করে ট্রাম চলেছে। চির-পরিচিত মামার বাড়ির ছাদ আর মামাতো ভাই-বোনদের চেনা মুখগুলি বদলাতে বদলাতে ট্রেনের কামরার ভিতরকাব অন্যান্য যাত্রীদের ঘুমন্ত চেহারাগুলি ফুটে উঠল। ট্রামের ঘড়ঘড়ানির বদলে রেলের চাকার মরচে-পড়া শব্দ। অচেনা স্টেশান ছাড়াতেই ঘুমিয়ে পড়লুম আবার—এবারে একেবারে নিশ্ছিদ্র ঘুম। কি ভাগ্যিস্ ভোব বেলা চোখটা একবার খুলে গেল। খুলতেই দেখি একটা স্টেশানে গাড়ি ঢুকছে। কযেকজন যাত্রী আড়া-মোড়া দিয়ে উঠে বসেছেন। জানলার পাশ থেকে কে সুর করে ডেকে উঠল টা-টা-নগর!

আলস্যটা বেশ জমে এসেছিল, তার উপর অমন একটা ঘুমপাড়ানি সুর! উঠতে আর ইচ্ছে করে না। কিন্তু কী করবো? আমার যাত্রা শেষ। পুঁটলিটা বগলে করে নেমে পড়লুম।

স্টেশানটা তখনও অন্ধকার-অন্ধকার—মিটমিটে বাতিগুলো তখনও নিভিয়ে দেয়নি। সামনের মাঠের উপর ঝোপগুলো কালো মেঘের টুকরোর মতো পড়ে রয়েছে। আমি একটা বেঞ্চিতে বসে ভাবলুম, যতক্ষণ না আলো হয় ততক্ষণ ঝিমিয়ে নিই। কিন্তু ঝিমুনি আব এলো না। চোখের সামনে দেখতে দেখতে মাঠের উপরকার অন্ধকার মুছে গেল।

আমি তখন উঠে কলতলায় গিয়ে চোখে-মুখে জল দিলুম। দাঁতন বিক্রি করছিল একজন। তার কাছ থেকে এক পয়সায় আটখানা দাঁতন কিনে, একখানা বেছে নিয়ে বেশ করে চিবিয়ে চিবিয়ে দাঁত মাজলুম। বাকিগুলো বিস্কুটের টিনে তোলা রইল। স্টেশানটায় দেখলুম সবই আছে—স্নানের ঘর, ওয়েটিং রুমে বেঞ্চি, চেয়ার, টেবিল। প্ল্যাটফর্মের এক কোণে ভিজে ছোলা আর গরম দুধ বিক্রি হচ্ছিল। তাই খেলুম। তারপর স্টেশানে পায়চারি করতে লাগলুম অনেকক্ষণ। ভারি চমৎকার লাগল স্টেশানটাকে। ভাবলুম বড় হয়ে আমি কী হবো? স্টেশানমাস্টার। তাই হতে পারলে বড স্থখের জীবন হবে। স্টেশানমাস্টার হতে গেলে কী পাস্ করতে হয়? কিছুই জানি না। বাবার কাছ থেকে জেনে নিতে হবে। কিন্তু নাঃ, এখন এ সব ভাবছি কেন? ঘর-মুখো যত ভাবনা। এখন আমায় অ্যাড্ভেঞ্চার করতে হবে। ছুটতে হবে অজানা অচেনা ভয়-জাগানো পথের দিকে লক্ষ্য রেখে।

একটা ট্রেন এসে পড়ল। অনেক যাত্রী নামল। কত রকমের লোক—বাংলা বিহারী উড়িয়া বুলি তাদের মুখে। ব্যস্ত সবাই। সকলেই মাল নামাচ্ছে মাল তুলছে। ঘাড় উঁচু করে কুলির জন্যে দাঁড়িয়ে আছে। হৈ-হৈ রৈ-রৈ হট্টগোল খানিকক্ষণ. তারপর স্টেশানটা আবার ফাঁকা হয়ে গেল। আমি তখন বেরোলুম স্টেশান ছেড়ে শহরের দিকে।

শহরটা নেহাতই শহর। সেই মুদির দোকান, কাপড়ের দোকান, পানের দোকান, সেই নোংরা গলি, চৌমাথায় পুলিস আর যত সব শহুরে লোক। অনেকক্ষণ এধারে ওধারে ঘুরে ঠিক করলুম স্টেশানেই ফিরে যাবো—সেখানে গিয়ে ঠিক করা যাবে, এর পর কী করা যায়। অনির্দিষ্ট ভাবে ঘুরে শেষে এগারোটার সময় স্টেশানে ফিরে এলুম।

ভাবছিলুম অ্যাড্ভেঞ্চারের গোড়ার দিকটা এই রকমই হয় সর্বত্র! সর্বত্রই কেমন আলগা আলগা, হাতের মুঠোর মধ্যে কিছুই আসে না। কোথায় যাচ্ছি, কী করছি কিছুরই ঠিক নেই। শেষে যখন অ্যাডভেঞ্চার জমে ওঠে, দুর্নিবার বেগে পরিণতির দিকে এগিয়ে চলে, তখনই ফুটে ওঠে তার স্বরূপ। দুনিয়ার লোক অবাক বিস্ময়ে বলে ওঠে—হাঁ আডভেঞ্চার

বটে। ওঃ, সঙ্গী হিসাবে বাঁদরের বাচ্চাটাকে যদি পেতুম তাহলেই এ-যাত্রাটা পূর্ণাঙ্গ হত এই কথা ভাবছি এমন সময় কানে এল—

—আজব তত্ত্ব—টাটকা খবর—দু' পয়সা!

দেখি খবরের কাগজওয়ালা স্টেশানে কাগজ বিক্রি করছে। কলকাতা থেকে সকালের ট্রেনে সেই বোধহয় কাগজ এসে পৌঁছেছে। আমি উঠে গিয়ে একখানা কিনে নিয়ে এলুম।

বেঞ্চিতে বসে পাতা উল্টোচ্ছি, হঠাৎ চোখে পড়ল, এক জায়গায় বড় বড় অক্ষরে লেখা—

॥ পুরস্কার ঘোষনা ॥

আমরা অবগত আছি যে ইংলণ্ডের বিখ্যাত কবি 'শেকস্‌পীয়র' যে বাক্সে তাঁর রচনাগুলি যত্ন করিয়া রাখিতেন, সেই বাক্সটি কালক্রমে ডাব্‌লিউ ডিক্‌সন্ কোং-এর বিস্কুটের কারখানায় আসিয়া উপস্থিত হয়। খোঁজ লইয়া জানিলাম ঐ বাক্স উক্ত কোম্পানী দ্বারা "মিক্‌স্‌ড্" বিস্কুটে পূর্ণ হইয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছে এবং ঐ বাক্সের নম্বর ৩০৩০৩।

যদি কোনো দোকানে বা কোনো ব্যক্তির কাছে ঐ নম্বরের ডাব্‌লিউ ডিক্‌সনের মিকস্‌ড্ বিস্কুটের বাক্স থাকে তিনি নিম্নলিখিত ঠিকানায় উহা লইয়া গেলে তাঁহাকে নগদ পাঁচ শত টাকা পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে।

শ্রীহরিপদ ঘোষাল
আজব-তত্ত্ব অফিস
৭১।১ সেণ্ট্রাল এভেনিউ, কলিকাতা

তাড়াতাড়ি আমার পুঁটলিটা খুলে বিস্কুটের টিনটা বার করে দেখলুম, কী আশ্চর্য, তার নম্বরটা ৩০৩০৩। ডাব্‌লিউ ডিক্‌সন্ কোং-এর মিক্‌স্‌ড বিস্কুটের ত্রিশ হাজার তিন শো তিন নম্বরের বাক্স! আমার কপালেই তাহলে পাঁচ-পাঁচ শো টাকা। বাঁদরের বাচ্চাটা কেমন করে আমাকে বিস্কুটের বাক্সটা পাইয়ে দিয়েছে মনে করে তার বাঁদুরে বুদ্ধির প্রশংসা করে উঠলুম। অবশ্য আমি প্রাইজ না পেলে বাবা পেতেন। আসলে বাবারই প্রাপ্য টাকাটা, কারণ বাক্সটা তাঁরই, আমি শুধু বিস্কুট-

গুলো এক বৈঠকে শেষ করেছি। তাহলেও এ ক্ষেত্রে টাকাটা আমি পেয়ে তারপর বাবার হাতে তুলে দেব এতে আমার কম গৌরব হবে না। সেই হাওড়া স্টেশানের বাবুটি যিনি মুঠো মুঠো ডিক্‌সনের বিস্কুট খান, তাঁর চোখেও আশা করি এই বিজ্ঞাপনটা পড়েছে? তিনি নিশ্চয় তাঁর জমানো টিনগুলি তুলে তুলে তাদের নম্বর মিলিয়ে দেখছেন। ওঃ, তিনি যদি জানতে পারতেন সেদিনের হাওড়া স্টেশানের সেই বাড়ি-থেকে-পালানো ছেলেটির হাতের সেই শূন্য ডিক্‌সনের টিনটিতেই ঐ নম্বর—তা হলে কী করতেন?

নাঃ, আর ভাবা যায় না। দেরি হয়ে যাচ্ছে। এখন একটা ফেরবার ট্রেন দেখতে হয়! সেই সময় কলকাতাগামী একটা এক্সপ্রেস্ ট্রেন এসে গিয়েছিল। চট্ করে একটা টিকিট কিনে তাইতে চেপে বসলুম।

ট্রেন যেমন ছুটে চললো, আজব-তত্ত্বের খবর আর গল্পগুলো একে একে পড়া হয়ে যেতে লাগল। শেষে আমি আজব-তত্ত্ব মুড়ে আবার ভাবতে বসলুম, পাঁচ-শো টাকা নিয়ে কী করা যায়? টাকাটা বাবারই প্রাপ্য, কিন্তু দৈবক্রমে যেহেতু আমারই হেফাজতে এসে পড়েছে বাক্সটা, আর ওর প্রায় সব বিস্কুটগুলো আমিই গলাধঃকরণ করেছি, সুতরাং আমারও একটা দাবি আছে। বাবাকে বললে হয়, ঐ টাকা থেকে কিছু নিয়ে আমায় একটা সাইকেল কিনে দিতে, যাতে করে মাঝে মাঝে আমি অন্তত ছোটোখাটো অ্যাড্‌ভেঞ্চারে বেরতে পারি। এই সব ভাবতে ভাবতে ট্রেন এসে হাওড়ায় পৌঁছল।

কলকাতায় এসে যখন পৌঁছলুম তখন সন্ধ্যে সাতটা। সেণ্ট্রাল এভেনিউ খুঁজে নিয়ে ৭১।১ এর খোঁজে হন্ হন্ করে চললুম।

সেখানে পৌঁছে দেখি একটা দোতলা বাড়ি। টাইম টেব্‌ল্‌টা চাদরে জড়িয়ে হাতে বিস্কুটের টিন আর খবরের কাগজটা নিয়ে আফিসে ঢুকলুম।

সামনেই এক ভদ্রলোক একটা গোল বেতের চেয়ারে বসে ছিলেন। কায়দা-দোরস্ত ভাবে তাঁকে একটি নমস্কার করে বললুম—শ্রীহরিপদ ঘোষালের সঙ্গে একটু দেখা করতে এসেছি।

ভদ্রলোকের চোখ সোজা গিয়ে পড়ল আমার বিস্কুটের টিনের

উপর। ' তিনি একটু কেশে বললেন—একটা বিস্কুটের টিনের জন্যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল—সেটাই আনা হয়েছে নাকি ?

বাক্সটি বাঁ হাত থেকে ডান হাতে নিয়ে আমি বললুম—হ্যাঁ। টাকাটা কখন পাবো বলতে পারেন ?

ভদ্রলোক বললেন—একটু বসুন। হরিপদবাবুকে ডেকে পাঠাচ্ছি।

আজব-তত্ত্ব আফিসে এর আগে কখনও আসিনি। এই সেই আফিস যেখান থেকে আমার প্রিয় পত্রিকা বার হয়। সারা পৃথিবীর কত বিচিত্র খবব কত পথ ঘুরে এই দু'টি কি তিনটি ঘরের মধ্যে এসে জমা হয়। কি বিচিত্র উপায়ে এরা দূর দূরান্তরের রঙিন বার্তা সংগ্রহ কবে কে জানে! কোথায় পশ্চিম-আফ্রিকা, সাহারা মরুভূমি, কোথায় মালয় দেশ, সেলিবিস্ দ্বীপপুঞ্জ, কোথায় কামাচ্‌কাটকা আলাস্কা, সেখানকাব ভূগোল, সেখানকাব আকাশ-বাতাস-নদী-নির্ঝর, জঙ্গল, পাহাড়, কী অদ্ভুত, কী অকল্পনীয়। সেখানে কত কী অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটছে, কত কি জন্মাচ্ছে, মবছে তার সবই এই দু'টি তিনটি ঘরের দুটি তিনটি মানুষের নখাগে। এই জগদ্বিখ্যাত আজব-তত্ত্ব আফিসে দুটি তিনটির বেশী মানুষই আমার চোখে পড়ল না। মনে মনে ভাবলুম, কি অদ্ভুত করিৎকর্মা এঁরা।

ঘড়িতে ঢং ঢং করে আটটা বেজে গেল। রাস্তার দিকের দরজাটাও সেই সঙ্গে সরে গেল। সে দিকে চোখ ফিরিয়ে যা দেখলুম তাতে আমার চক্ষু স্থির হয়ে গেল। চোখটা একবার ভালো করে মুছে দেখলুম—নাঃ, এ ভুল হতেই পাবে না—বাবাই সশরীরে উপস্থিত।

প্রথমটা বাবাকে দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিলুম বটে, কিন্তু তখনই আবার সামলে নিয়ে ভাবলুম—এদের কাছ থেকে পাঁচ-শো টাকা আদায় করে বাবাকে একটু তাক লাগিয়ে দিই।

আমি ভদ্রলোকটিকে আবার বললুম—কই মশায়, আমার টাকা ?

ভদ্রলোক বললেন—আমরা তো জানিনে, উনিই এখানে এসে বিজ্ঞাপন দিয়ে গেছেন, উনিই জানেন।

আমি বললুম—মিথ্যে বলছেন কেন ? আমার বাবার নাম কোনো

কালে হরিপদ ঘোষাল নয়। এক্ষুনি আপনারা সত্যিকারের হরিপদ ঘোষালকে বার করুন বলছি।

বাবা হঠাৎ এক ধমক দিয়ে বলে উঠলেন—থাম্!

এবারে বাবার চালাকিটা বুঝতে পারলুম। হরিপদ ঘোষালের নামে বিজ্ঞাপন দিয়ে বাবা আমায় ধরেছেন, সেই সঙ্গে আমার অ্যাড্ভেঞ্চারটি পাকবার আগেই মাটি করে দিয়েছেন।

বাবা অবশ্য আমায় আর কিছু বললেন না। মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে বাবার সঙ্গে বাড়ি ফিরে আসতে হল, সঙ্গে আমার সেই টাইম-টেব্ল্, বিছানার চাদর, আর বিস্কুটের টিন। বিস্কুটের টিনের মধ্যে সাত টুকরো দাঁতন।

॥ ২ ॥

সবে গ্রীষ্মের ছুটি ফুরিয়ে নতুন আষাঢ়ের মেঘ দেখা দিয়েছে। এই লম্বা ছুটির পর ইস্কুলটা আমার কাছে যেন কয়েদখানার মত একঘেঁয়ে হয়ে উঠল। আজ ইস্কুল থেকে ফিরে আসবার একটু আগে ছোট এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। ছাদের কোণে পা ছড়িয়ে বসে আকাশ-ঘেরা আষাঢ়ের নতুন মেঘের সাজসজ্জার দিকে চোখ দুটো খুলে দিয়েছি। চোখে যেন কিসের ঘোর লাগছে। মাঝে মাঝে ভিজে হাওয়া এসে মুখে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, আর তার সঙ্গে বৃষ্টির জলে-ভেজা মাটির সোঁদা গন্ধ নাকে লেগে মনটাকেও অস্থির করে তুলছে। এক জোড়া ডানা পেলে এতক্ষণ নিশ্চয়ই ঐ মেঘগুলোর সঙ্গে গা ভাসিয়ে কোথায় চলে যেতুম তার ঠিক থাকতো না।

মন চলেছে উড়ে, দেহ পিঁজরাবদ্ধ। আর থাকতে না পেরে বলে উঠলুম—উঃ, আর তো এখানে টেঁকা যায় না। কত কাল আর বন্ধ থাকব? মনে হল বড় বেশী বন্দী হয়ে রয়েছি। সব বাধা ভেঙে বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করল। গেলবারকার অ্যাড্ভেঞ্চারটার কথা বার বার মনে পড়তে লাগল। এমন ভাবে আমার অ্যাড্ভেঞ্চারটাকে মাটি করে দেওয়ার জন্যে বাবার উপর রাগ ধরতে লাগল। বাধা না দিলে এতদিনে হয়তো আমার কত খ্যাতিই দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ত।

কত লোকে আমার ভ্রমণ-বৃত্তান্তের রোমাঞ্চকর কাহিনী খবরের কাগজে ছাপাবার জন্যে আমাকে এসে পেড়াপীড়ি করত, কত লোক হয়তো সেই বৃত্তান্ত দফায় দফায় পড়বার জন্যে উন্মুখ হয়ে দিন গুণতে ·থাকত। ছি, ছি, বাবার জন্যে সমস্ত মাটি হল। এই তো অ্যাড্‌ভেঞ্চারের বয়েস! এত উৎসাহ, এত ক্ষমতা, এত তৎপরতা, এ সব কি আর বয়েস হলে থাকবে? অ্যাড্‌ভেঞ্চারে যেতে হয় তো এই বয়সেই যাওয়া উচিত। ভাবতে ভাবতে শরীরের সমস্ত রক্ত ঝাঁঝিয়ে উঠল। বসে থাকতে পারলুম না। উঠে পড়ে জোরে জোরে পা ঠুকে ঠুকে শেওলা-পড়া ছাদের এ-দেয়াল থেকে ও-দেয়াল অবধি পায়চারি করতে লাগলুম। মনে হতে লাগল, বোধহয় এখনই একটা অ্যাড্‌ভেঞ্চারে বেরিয়ে পড়ব। মনে হল বাইরে থেকে যেন ডাক আসছে।

আজব-তত্ত্বটা তখনও পড়া হয়নি। চঞ্চল মনটাকে একটু স্থির করবার জন্যে আজব-তত্ত্বেব পাতাব উপর চোখ বোলাতে লাগলুম। একটা খবর দেখলুম—এক সাহেব, মেম ও তাঁদের ছোট ছেলে নাকি শ্লেজ্ গাড়িতে করে সাইবেরিয়ার বরফের মরুভূমি পাব হবার জন্যে বেরিয়েছিলেন। অর্ধেক পথ যাবার পর সাহেব-মেম দুজনেই ঠাণ্ডায় মারা পড়েন। কিন্তু ছোট ছেলেটি অসীম সাহসে এবং অদ্ভুত কৌশলে বরফের মরুভূমি পাব হয়ে গন্তব্য স্থানে গাড়ি নিয়ে পৌঁছে গেছে। এই নিয়ে কাগজে কাগজে হৈ হৈ ব্যাপার! আর সহ্য হল না। খবরের কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এক দৌড়ে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এলুম।

একটা সামান্য সাহেবেব ছেলে সাইবেরিয়া পার হয়ে যেতে পারে, আর আমার দ্বারা কিছুই সম্ভব হবে না? দেখুক তবে একবার পৃথিবীর লোক এই বাবুই-এর অ্যাড্‌ভেঞ্চার করবার কী আশ্চর্য ক্ষমতা! কিছু না কিছু করবই আমি। বাড়িব বাধাকে কাটিয়ে উঠব। বাড়ির বাধা, বাড়ির বাধা, বাড়ির বাধা! তার উপর ইস্কুলের বাধা। এই সব বাধার জন্যেই তো অ্যাড্‌ভেঞ্চার হয় না। বাবা-মাও বোঝেন না, মাস্টার-মশায়রাও তেমনি। কবে যে ছোট ছেলেরা স্বাধীনতা পাবে! মুশকিল এই, যখন স্বাধীন হবো, তখন তো আর ছোটটি নেই, বড় হয়ে গেছি, আর সেই সঙ্গে কাকাদের মতন ভীষণ সংসারী হয়ে পড়েছি। তখন কি

আর অ্যাড্‌ভেঞ্চারের কথা ভাববো ? আমি হয়তো বড় হয়ে কাকাদের মতন সংসারী হবো না, নতুন নতুন দেশ, নতুন নতুন অভিযানই আমায় টানবে, কিন্তু এখন আমার অতদিন অতকাল অপেক্ষা করার ধৈর্য কোথায় ? কিছু একটা এখনই করা দরকার। যা পারি।

ভাবতে ভাবতে কোন্ রাস্তা দিয়ে কতটা এসে পড়েছি কিচ্ছু হুঁস ছিল না। যখন হুঁস হল তখন রাস্তাটাকে ঠিক চিনতে পারলুম না, কিন্তু রাস্তাটার কেমন একটা অদ্ভুত রকমের ভাব দেখে থমকে দাঁড়ালুম। কেমন যেন থম্‌থমে। লোকজন কম। যারা হাঁটছে সকলেরই যেন কিসের তাড়া। রাস্তার দু-ধারেব বাড়িগুলো চুপচাপ, তবু কেন জানি না মনে হয় সবাই আড়াল থেকে দেখছে। কী দেখছে কে জানে ? সামনে দিয়ে দেখলুম কয়েকটা পুলিস হন্ হন্ করে একদিকে চলে গেল। কয়েকজন লোক কোথা থেকে হঠাৎ এসে ছুটতে ছুটতে গলির ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল। কয়েকজন দোকানদার দেখি তাদের দোকানের দরজা বন্ধ করে সরে পড়ছে। আমি এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলুম, এইবার চলতে আরম্ভ করলুম। রাস্তা ধরে খানিকটা এগিয়ে যেতেই একটা বড় রাস্তা। বড় রাস্তা ধরে বাঁ-পাশে ঘুরতেই দেখি একরাশ পুলিস। আমি এগোতেই একজন বাধা দিয়ে বলল—ওদিকে যাবেন না, দাঙ্গা আরম্ভ হয়ে গেছে।

ভাবছি, দাঙ্গা আবার কখন হল ? ও, তাই বুঝি চারিদিকের এই রকম বিত্রস্ত ভাব ? বাঃ, এ তো বেশ একটা অ্যাড্‌ভেঞ্চারের মধ্যে এসে পড়া গেল।—

এই সময় হঠাৎ চোখে পড়ল, একটু দূরে একটা বাঁদর-নাচ-ওয়ালা কয়েকটা বাঁদর নিয়ে চলেছে। তাদের মধ্যে একটা ছোট বাঁদরের বাচ্চা—সেবারে যেটাকে দেখেছিলুম, যেটা আমায় বিস্কুটের টিন খুঁজে এনে দিয়েছিল—ঠিক সেইটার মতো।

ভাবলুম—ঐ বাচ্চাটাকে যদি আদায় করা যায়—একটাকা, দু-টাকা যা লাগে দেব—পুষলে পরে চমৎকার সঙ্গী হবে আমার অ্যাড্‌ভেঞ্চারের। এই ভেবে বাঁদরওয়ালাকে ধরবার জন্যে আমি সেই দিকে তাড়াতাড়ি পা চালালুম।

কিন্তু আবার বাধা। অনেক পুলিস সেখানে। দু-জন হাত ফাঁক করে দাঁড়াল।

--ও দিকে যাবেন না।

আমি বললুম—কী মুস্কিল, আমি শুধু ঐ বাঁদরওয়ালার কাছে যেতে চাই—দাঙ্গার মাঝে যাচ্ছে কে ?

কিন্তু পুলিস অনড়।

একজন বললে—এইটুকু ছেলে, দাঙ্গার বাজারে রাস্তায় বেরিয়েছ কেন ?

আমি একটা ফাঁক খুঁজছি, দৌড় দেব বলে, সেই সময় কে যেন এসে আমার কাঁধ চেপে ধরলে। পিছন ফিরে দেখি, কোট-প্যাণ্ট-হ্যাট পরা, চোস্ত করে দাড়ি-গোঁফ কামানো লম্বা-মতো এক ভদ্রলোক। ভারি রাগ ধরল। এক ঝাঁকানিতে কাঁধ ছাড়িয়ে নিয়ে বললুম—কে আপনি মশায় ? খামকা কাঁধ ধরেন কেন ?

বাবুটি খপ্ করে আমার হাত ধরে বললেন—ওদিকে যাচ্ছ কোথায় ?

আমি চটে বললুম—ছাড়ুন না মশায়, আমি ঐ বাঁদর-নাচওয়ালার কাছে যেতে চাই।

বাবুটি ভাবলেন—আমি বুঝি বাঁদর-নাচ দেখবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছি। বললে—থাক্ থাক্, এই দাঙ্গা-মারামারির বাজারে আর বাঁদর-নাচ দেখে না। খুব হয়েছে।

আমি বললুম—আমি কচি খোকাটি নই যে বাঁদর-নাচ দেখবার জন্যে ঘুম ধরছে না। ছাড়ুন, আমার অন্য কাজ আছে।

বাবুটি বললেন—কী কাজ শুনি ?

দেখলুম, এ তো আচ্ছা বেয়াদব। না শুনে কিছুতেই ছাড়বে না দেখছি। বললুম আমি অ্যাড্ভেঞ্চারে বেরিয়েছি, তাই আমার একটা বুদ্ধিমান বাঁদর চাই।

বাবুটি বললেন—অ্যাড্ভেঞ্চারে বেরিয়েছ, বুদ্ধিমান বাঁদর ? যাও না, আর একটু এগিয়ে, খুব অ্যাড্ভেঞ্চার হবে। সকলকে ছোরা আর পাকা বাঁশের লাঠি নিয়ে তোমার জন্যে সব ঘাপটি মেরে

দাঁড়িয়ে আছে। চটে উঠে বললুম—ও কি মশায়, খামকা গালাগাল দেন কেন?

বাবুটি তখন এক হাঁক দিলেন—পাহারাওয়ালা!

ঝড়ের মতো একটা পাহারাওয়ালা ছুটে এসে সেলাম করে দাঁড়াল।

বাবুটি পাহারাওয়ালাকে বললেন—একে নিয়ে যাও আমার থানায়। আটক করে রাখবে।

পাহারাওয়ালা পাঁজা-কোলা করে আমায় তুলে নিল। পুলিসের বাবুটি হন্ হন্ করে একদিকে চলে গেলেন।

আমি হতাশ হয়ে পড়লুম। ব্যাপারটা কতদূর গড়ায় তাই দেখতে পাহারাওয়ালার সঙ্গে পুলিসবাবুর থানায় গিয়ে উপস্থিত হলুম।

প্রায় যখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, পুলিসের বাবুটি থানায় ঢুকলেন। একটা ঘরের মধ্যে আমি আটক ছিলুম। পুলিসের বাবুকে আসতে দেখে আমি বললুম—আর কেন ভদ্রলোকের ছেলেকে মিছে কষ্ট দেন মশায়?

তিনি আমার দিকে কয়েক পা এগিয়ে এলেন।

আমি বলে চললুম—ঢের তো হল। এইবার বিদায় দিন না।

পুলিসবাবু কোনো কথা না বলে সোজা আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। আমার আপাদ-মস্তক একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েই পিছন ফিরে এক পাহারাওয়ালাকে কী যেন ইশারা করলেন। পাহারাওয়ালা এগিয়ে এসে ফস্ করে আমার দু-হাতে হাত-কড়া লাগিয়ে দিল। তারপর পুলিসের বাবুর আর এক ইশারায় আমাকে টানতে টানতে পুলিসের বাবুর পিছনে পিছনে নিয়ে চলল। যেখানে গিয়ে আমরা উপস্থিত হলুম সেটা আধা-অন্ধকার একটা ঘর। ঘরের একদিকে লম্বা গরাদ-দেওয়া একটা জানলা, তার পিছনে বারান্দা। অপর দিকে দরজা। অন্য দু'দিকে শুধু দেয়াল। আসবাবের মধ্যে নানারকম কাগজে আর ফাইলে ভরা টেবিল আর তার পিছনে উঁচু একটা চেয়ার। আমাকে টেবিলের সামনে দাঁড় করানো হল। পুলিস বাবু টেবিলটাকে চক্র মেরে উঁচু চেয়ারে গিয়ে বসলেন। তারপর কোনো দিকে না তাকিয়ে শুধু একবার বললেন—হুঁঃ।

আমি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম।

পুলিসের বাবু তখন আমার দিকে ফিরে বললেন—এখন সত্যি করে বল তোমার নাম কি ?

আমার কথা কইতেও ঘৃণা হতে লাগল। আমি কোনো উত্তর না দিয়ে অন্যদিকে চেয়ে রইলুম।

পুলিসের বাবুটি বললেন—এই শেষবার তোমার নাম বলতে হুকুম করছি। না বললে—

আমি ভীষণ চটে বলে উঠলুম—কেন মশায়, আমাকে কি আসামী পেয়েছেন না কি ?

পুলিসের বাবু মৃদু হেসে বললেন—তবে তুমি কি ?

—আমি যা তাই !

—ঠিক। আজকের দাঙ্গায় তুমিই আসামী !

আমি বললুম—তার মানে ?

পুলিসের বাবু বললেন—সে কথা পরে হবে, এখন বল তোমার নাম কি ?

বলে তিনি এক প্রস্থ কাগজ আর একটা পেন্সিল টেনে নিলেন।

আমি বললুম—আমি বলব না।

পুলিসের বাবু বললেন—বেশ, তবে আমিই বলছি। তোমার নাম 'ফক্‌রে' গুণ্ডা। গুণ্ডার সর্দার। আজকে কলকাতা শহরের দাঙ্গা হাঙ্গামার জন্য তুমিই দায়ী। তুমিই বাধিয়েছ দাঙ্গা।

বলে ঘস্ ঘস্ করে কাগজের উপর লিখে চললেন। আমার সেদিকে তাকাতেও ইচ্ছে করল না ; তবু কয়েকটা শব্দ চোখে পড়ল ফক্‌রে গুণ্ডা —দাগী আসামী—...জুলাই তারিখের দাঙ্গা—দায়ী—

পুলিসের বাবু কট্‌মট্‌ করে তাকিয়ে বললেন—স্বীকার করছো, তুমিই ফক্‌রে গুণ্ডা ?

আমি বললুম—কখ্‌খনো নয়।

পুলিসের বাবু বললেন—স্বীকার করো আর না-ই করো, প্রমাণ আমাদের কাছে আছে। এই দেখ। বলে পকেট থেকে তিনি একটা ফটোগ্রাফ বার করলেন।

—হ্যারিসান রোডে ঠিক যে জায়গায় তুমি দাঙ্গা শুরু করেছিলে, সেইখানে এই ছবি উঠেছে। বলে ফটোগ্রাফটা আমার দিকে এগিয়ে ধরলেন।

আমি আশ্চর্য হয়ে দেখলুম, সত্যিই আমার চেহারা! কী করে যে হ্যারিসান রোডে আমার ছবি উঠল, ভেবে পেলুম না। বরং বাড়িতে কাকার তোলা যে ফটোগ্রাফটা ছিল, এটা অনেকটা সেই রকমই বোধ হল।

পুলিসের বাবু বললেন—তোমার বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে যে আজকের দাঙ্গার জন্যে তুমিই দায়ী।

আমি বাধা দিয়ে বললুম—আপনার মত বোকা তো দেখিনি! এতটুকু ছেলে কখনও গুণ্ডার সর্দার হতে পারে?

পুলিসের বাবু হাঃ হাঃ হাঃ করে হেসে বললেন—এতটুকু ছেলে? এতটুকু ছেলেই বটে! কে না জানে ফক্‌রে গুণ্ডা কী রকম। চিরকালই সে ছোট্ট বেঁটে। মাকুন্দে। ছেলেমানুষের মতো চেহারা। গোঁফ-দাড়িই ওঠেনি। যাই হোক, এখন তোমার আড্ডা কোথায় সেইটে বল। ওইটাই আমাদের দরকার।

আমি চটে উঠে বললুম—গুণ্ডার আড্ডা কোথায়, তার আমি কি জানি?

পুলিসের বাবু বললেন—বলবে না তাহলে? আমি তোমার বিচারক। শেষবারের মতো তোমায় জিজ্ঞেস করছি তোমাদের আড্ডা কোথায়? তার উত্তর দাও।

আমি দেখলুম, এ তো আচ্ছা বিপদ; বললুম—বিচারঘর কখনও এ রকম হয় না। সেখানে ঘর-ভরা লোক গিশ্‌গিশ্‌ করে। সাক্ষীসাবুদ থাকে, উকিলমক্কেল থাকে।

পুলিসবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন—গুণ্ডার বিচার এই ঘরেই হয়ে থাকে।

আমি বললুম—কেন মশায় ভদ্রলোকের ছেলেকে কষ্ট দিচ্ছেন? আপনার চালাকি সব বুঝতে পেরেছি।

পুলিসের বাবু আবার হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলেন।

—ভদ্রলোকের ছেলে ? হাঃ হাঃ। আমার চালাকি বুঝতে আর খুব বেশী দেরি হবে না। শোনো তাহলে—কাল সকাল ছ-টার মধ্যে তুমি যদি তোমার গুণ্ডার দলকে ধরিয়ে না দাও, তোমার ফাঁসি হয়ে যাবে। এই দেখ তার পরোয়ানা।

সর্বনাশ, একেবারে ফাঁসি! আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। চীৎকার করে বললুম—এ কা অন্যায় আপনার। গুণ্ডার খবর আমি কি জানি ? আপনি আমার বাড়িতে লোক পাঠান, দেখুন না বাড়ির লোক কি বলে।

পুলিসের বাবু বললেন—তোমার বাড়ি ? কোথায় তোমার বাড়ি ? সেই খোঁজই তো আমরা চাই।

আমার প্রায় কান্না এসে গিয়েছিল। কান্না চেপে বললুম—৭নং শিবু সমাদ্দারের স্ট্রীট। আপনি সেখানে লোক পাঠিয়ে বলুন, আমার নাম বাবুই, আমি এখানে আটকা আছি।

পুলিসের বাবু বললেন—তোমার নাম বাবুই ? তা হতে পারে—গুণ্ডাদের অমন কত ছদ্মনাম থাকে। যাই হোক আমি ৭ নম্বর শিবু সমাদ্দার স্ট্রীটে খোঁজ নিচ্ছি। এই বলে আমাকে একটা গরাদ-দেওয়া ঘরের মধ্যে বন্ধ করে তিনি চলে গেলেন।

বসে আছি তো বসেই আছি। অনেক বাদে পুলিসের বাবু আবার এসে আমার ঘরে ঢুকলেন। মুখ দেখলুম আষাঢ়ের মেঘের মত থমথমে।

তিনি খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে শেষে বললেন—হুঁঃ!

আমি জিজ্ঞেস করলুম—আমার বাড়িতে লোক পাঠিয়েছিলেন ? কী বললেন তাঁরা ?

রাগত-স্বরে পুলিসবাবু বললেন—দেখ্ ফকুরে, পুলিসের সঙ্গে চালাকি করার ফল তোকে সমুচিত ভুগতে হবে।

আমি অবাক হয়ে বললুম—কী চালাকি করলুম আমি ?

তিনি এক ধমক দিয়ে বললেন—কী চালাকি ? তোমার জন্যে আজ পুলিসের মুখ দেখাবার উপায় নেই। ৭ নম্বর শিবু সমাদ্দার স্ট্রীট এক ভদ্রলোকের বাড়ি। সেখানে ফকুরে গুণ্ডার আড্ডা বলে খানা-তল্লাস

করতে গিয়ে আমাদেরই বেইজ্জত, অপমান। কাল তোমার ফাঁসি মাপ হবার কোনোই সম্ভাবনা নেই।

আমি ব্যস্ত হয়ে বললুম—গুণ্ডার আড্ডা কেন? ভদ্রলোকের বাড়িই তো। আমার বাবা মা সবাই সেখানে—

পুলিসের বাবু বাধা দিয়ে বললেন—কোনো কথা শুনতে চাই না। তোমার কোন কথায় বিশ্বাস নেই।

আমার মুখের সামনে একটা দরজা ঝন্ করে বন্ধ হয়ে গেল। বুঝলুম সত্যিই আমি বন্দী।

এত বড় ভুল যে কলকাতার পুলিসের কাজে কর্মে ঘটতে পারে তা আমার এর আগে কোনো কালে জানা ছিল না। আর যে সে ভুল নয়—একেবারে ফাঁসির আসামীতে ভুল। আমি ভাবলুম—কালকে তো আমার ফাঁসি হয়ে যাবে। কিন্তু তার পর যখন প্রকাশ পাবে, আমি ফক্‌রে গুণ্ডা নই, আমি বংশলোচন সরকারের ছেলে বাবুই সরকার তখন? তখন আর কি? আমি তো ততক্ষণে মরেই গেছি। ভুল ভাঙলেও এ ভুল শোধরানো তো আর যাবে না। সেই গরমের মধ্যে মৃত্যুর বিভীষিকার কল্পনা করে আমি হি হি করে কেঁপে উঠলুম।

মাথার মধ্যে নানারকম দুশ্চিন্তা মৌমাছির ঝাঁকের মতো বোঁ বোঁ করে ঘুরে বেড়াতে লাগল। ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। একটা স্বপ্ন দেখলুম যেন সেই বাঁদরের বাচ্চাটা এক মায়া-বলে জেলখানার মধ্যে ঢুকে আমায় উদ্ধার করে নিয়ে গেছে। চারিদিকে খোঁজ খোঁজ খানাতল্লাশী। আমি ততক্ষণে আশ্চর্য এক অ্যাড্‌ভেঞ্চারের দেশে পৌঁছে অ্যাড্‌ভেঞ্চার শুরু করে দিয়েছি। কিন্তু পুলিসের বাবু তখনও আমায় ছাড়েননি। ডিটেক্‌টিভ সেজে আমায় গ্রেপ্তার করবার জন্যে আমার পিছনে ছুটে আসছেন। আমি প্রাণপণে পালাবার চেষ্টা করছি, কিন্তু কোনোমতেই আমার পা চলছে না। পুলিসের বাবু হু হু করে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন—ধরে ফেললেন বলে, আর দেরি নেই। আমি চীৎকার করে উঠলুম বাঁদর ভাই, বাঁদর ভাই, রক্ষা কর।

এমন সময় ঘুম ভেঙে গেল।

ক্যাঁচ করে দরজা খুলে গেল। আমি দেখলুম পুলিসের বাবু। তাঁর

মুখ ভীষণ গম্ভীর! তিনি আমার দিকে চেয়ে বললেন—দেখ ফক্‌রে, কাল এই জেলখানায় আমার কাছে একজন সন্ন্যাসী এসেছেন। মস্ত গুণী লোক। তিনি একজন ফাঁসির আসামী নিয়ে একটা ভয়ানক পরীক্ষা করতে চান। তোমাকে সেই পরীক্ষা দিতে হবে।

আমি শিউরে উঠে বললুম—কী পরীক্ষা?

পুলিসের বাবুটি বললেন—তোমার ফাঁসি তো হবেই, কিন্তু সন্ন্যাসীর এই পরীক্ষা যদি সফল হয় তোমার প্রাণ বাঁচতেও পারে।

আমি অস্থির হয়ে বললুম—বলুনই না কী পরীক্ষা।

পুলিসের বাবু বললেন—বলছি শোনো তবে। তোমার গলাটা আমাদের জল্লাদ এক কোপে কেটে ফেলবে, সে সময় তুমি একটুও নড়বে না, কারণ গলা তোমার ধড়ের উপরেই থাকবে। সন্ন্যাসী এসে তখন তোমার নড়বড়ে মাথার উপর মন্ত্র-পড়া জল ছিটিয়ে দেবেন। এই করলেই কাটা-মুণ্ডু আবার জোড়া লেগে যাবে, মরা মানুষ বেঁচে উঠবে। দেখা যাক কী হয়। যদি বেঁচে উঠতে পারো মুক্তি পাবে। কারণ একজন মানুষকে দু-বার বধ করার আমাদের কোনো আইন নেই। এখন এসো আমার সঙ্গে।

কথাটা শুনে আমার মোটেই ভরসা হল না। আমি ভয়ে ভয়ে পুলিসের বাবুর সঙ্গে বধ্যভূমিতে উপস্থিত হলুম। পুলিসের বাবু বললেন —চোখ দুটো জোর করে বুজে এখানে চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকো। যতক্ষণ না কাটা-মুণ্ডু জোড়া লাগে, একটুও নোড়ো না বা একবারও চোখ খুলো না। একটু নড়েছো কি, চোখ খুলেছ কি চিরকালের মতো মরণ—আর প্রাণ ফিরে পাবে না।

হাত-পা সোজা করে চোখ বুজে আমি কাঠের মতো দাঁড়িয়ে রইলুম। পুলিসের বাবু বললেন—আমি জল্লাদ আর সন্ন্যাসীকে নিয়ে আসছি, সাবধান। বলে তিনি চলে গেলেন।

একটু পরে শুনলুম, ঘরে যেন কারা ঢুকলো। বেজায় ইচ্ছে করতে লাগলো চোখটা একটু ফাঁক করে দেখে নিই জল্লাদের চেহারাটা কেমন, সন্ন্যাসীকেই বা কেমন দেখতে। কিন্তু সাহস হল না। তারপরই ঝন্ ঝন্ একটা শব্দ শুনতে পেলুম। ঐ বোধ হয় খড়গ বার করছে।

এক জোড়া পায়ের শব্দ আমার কাছে এগিয়ে এল। হঠাৎ ঘাড়ের উপর সজোরে একটা ধাক্কা খেলুম। ঐ রে, বোধহয় খাঁড়ার কোপে আমার মাথাটা কাটা পড়ল! প্রাণপণে চোখ বুজে রইলুম, সব রকম ভাবনা চিন্তাকে দমন করে। ভীষণ ইচ্ছে করতে লাগল, হাত দুটো একবার তুলে দেখে নিই মাথার অবস্থাটা কী রকম। কিন্তু হাত নাড়বার তো যো নেই। নড়লেই সর্বনাশ! আমি আরও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। চোখ-দুটোও ভয়ানক ভাবে চাইতে লাগল, চট্ করে একবার পাতা খুলে দেখে নেয়। কিন্তু উপায় নেই। চোখের পাতা খুললেই হয় তো বিপর্যয় হয়ে যাবে।

খানিক বাদে আমার মনে হল, কে আমার মাথায় জল ছিটিয়ে দিচ্ছে। ঐ বোধহয় সন্ন্যাসীর মন্ত্র-পড়া জল আমার মাথায় পড়ছে। কী হয় এখন, কী হয় এখন! আমি হাত দুটোকে প্রাণপণে আরও কাঠ করে রাখলুম। চোখ দুটোকে জোর করে বন্ধ করে রাখলুম। এমন সময় শুনলুম, কে যেন মোটা গলায় বলে উঠল—সব ঠিক হো গয়া।

শুনলুম পুলিসের বাবু বলছেন—ও হে এবার চোখ খোল।

ভয়ে ভয়ে আস্তে আস্তে চোখ খুললুম। দেখলুম, যেমন ছিলুম তেমনিই রয়েছি। কাঁধের উপর মুণ্ডু রয়েছে। ঝাঁকিয়ে দেখলুম বেশ শক্ত করে জোড়া। উঃ হাঁফ ছেড়ে বাঁচা গেল। শুধোলুম—সন্ন্যাসী ঠাকুর কোথা? একবার পায়ের ধুলো নেবো যে।

পুলিসের বাবু বললেন—এইমাত্র ছিলেন এখানে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেছেন।

দরজার দিকে চোখ ফেরাতে দেখি বাবা ঢুকছেন।

আমি অবাক হয়ে বললুম—একি বাবা এখানে?

বাবা কিছু বললেন না, কিন্তু পুলিসের বাবু বললেন—সে কি ফক্‌রে? খবর পেয়ে তোমার বাবাও এসে পড়েছেন নাকি? যাও তাহলে এই বেলা সরে পড় বাবার সঙ্গে।

বাবা আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেন। আমি মাথা চুলকে ভাবতে-ভাবতে চললুম—তাই তো, এ কি-রকম হলো? এ কি রকম হলো?

বাড়ি এসে মা-র কাছে খাবার চাইতে গিয়ে শুনতে পেলুম মা তাঁর সইয়ের সঙ্গে বলাবলি করছেন—আচ্ছা, কর্তার কাণ্ডটা কী দেখ দেখি। শহরে দাঙ্গা। আমরা এদিকে ছেলে কোথা গেল, ছেলে কোথা গেল বলে ভাবনায় মরে যাই, আর ওদিকে দুই-বন্ধুতে মিলে ওইটুকু ছেলেকে সারাটা সন্ধ্যে কী নাকালটাই না করেছেন!

॥ ৩ ॥

বার বার আমার অ্যাড্‌ভেঞ্চারগুলো এমনি ভাবে মাটি হয়ে যাচ্ছে দেখে আমি মনে মনে ঠিক করলুম, নাঃ এ রকম আর নয়, এখন কিছুদিন চুপচাপ বসে থাকা যাক। কিছু না করে শুধু অপেক্ষা করা যাক সুযোগের। তারপর ভালো একটা ফাঁক পেলে এমন পালান্ পালাবো যে তখন আমায় খুঁজে বার করে কার সাধ্য। এই ভেবে আমি শান্ত শিষ্ট ছেলেটির মতো দিন কাটাতে লাগলুম।

বাড়িতে দুস্টু ছেলে বলে আমার খুব খ্যাতি ছিল। সেই আমি অমন ধারা চুপচাপ হয়ে যেতে সকলে বেশ একটু নিশ্চিন্ত হলেন। মাসীমা তো খুশী হয়ে আমায় একটা ম্যাজিক লণ্ঠনই কিনে দিলেন। সেই ম্যাজিক লণ্ঠন দিয়ে আমি খুব ছবি দেখতে লাগলুম। সবাই নিশ্চিন্ত হলেন, একমাত্র বাবা ছাড়া। বাবা কেমন করে যেন আমার দিকে তাকাতেন; তাঁর কপালের বলি রেখাগুলো গভীর হয়ে উঠত! বেশ বুঝতুম আমার ঐ রকম হঠাৎ ভালোমানুষ হয়ে যাওয়া বাবা মোটেই পছন্দ করছেন না, আমাকে নিয়ে তাঁর ভাবনা বরং বেড়েই যাচ্ছে। মাকে কী সব বলতেন ফিস্ ফিস্ করে। বুঝতুম আমার বিষয়ে কথা হচ্ছে, কিন্তু শুনতে পেতুম না।

বাবা যে আমার মনের ভাব খানিকটা আঁচ করতে পেরেছিলেন তার প্রমাণ একদিন সন্ধ্যাবেলা পেলুম।

পড়বার ঘরের আলোটি জ্বেলে সবেমাত্র বই খুলে বসেছি, এমন সময় বাবা ডেকে পাঠালেন। আমি যেতেই বাবা পকেট থেকে চামড়ার নোট-কেসটা বার করে তার থেকে গুনে গুনে কয়েকটা নোট বার করতে লাগলেন। তারপর সেগুলোকে টেবিলের উপর রেখে বললেন—এই

নাও, আর কী কী জিনিস তোমার দরকার বলো, আনিয়ে দিচ্ছি।

আমি অত্যন্ত অবাক হয়ে গেলুম; ভাবলুম, বাবা কি আমায় ত্যাজ্যপুত্র করবার বন্দোবস্ত করেছেন নাকি? কিছুই বুঝতে না পেরে বললুম—কিসের দরকার? কী হয়েছে?

বাবা গম্ভীর ভাবে বললেন—তুমি অ্যাড্‌ভেঞ্চারে যাচ্ছ। তোমার কী কী দরকার তুমিই ভালো জানবে, সে আমরা কী করে বলবো?

আমি বললুম—কে বললে যে আমি অ্যাড্‌ভেঞ্চারে যাচ্ছি?

বাবা বললেন—সে কথা যাক্। তুমি যেতে চাও কিনা?

আমি বললুম—তা চাই।

বাবা বললেন—বেশ, এবারে তাহলে বাড়িতে না বলে পালিয়ে যাবার দরকার নেই, আমরাই তোমার অ্যাড্‌ভেঞ্চারের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

আমি খানিকটা অবাক হয়ে আমার পড়বার ঘরে চলে গেলুম। প্রস্তাবটা আমার মন্দ লাগল না। অ্যাড্‌ভেঞ্চারে যেতে গেলে যে লুকোচুরি করতে হবে, তারই বা দরকার কী? সত্যিকার অ্যাড্‌ভেঞ্চার তো বীরত্বের ব্যাপার—এর মধ্যে লুকোবার কী আছে? সত্যি কথা বলতে কি, আমাকে যে একলা যেতে হবে তারই বা কী মানে? বাবাও তো আমার সঙ্গে যেতে পারেন; তাহলে শুধু একা আমার কেন সমস্ত সরকার পরিবারের নাম উজ্জ্বল হবে। কিন্তু নাঃ, বাবাকে যতদূর জানি, তিনি আমার সঙ্গে অ্যাড্‌ভেঞ্চারে বেরোবেন না। ওটাকে উনি যে ঠিক দুষ্টুমি বলে ভাবেন তা নয়, তবে পাগলামি বলে ভাবেন। পাগলামি আমার সাজতে পারে, বাবার কি সাজবে? অতএব আমাকে একাই যেতে হবে, তবে আর দেরি নয়, কালই। দেরি করলে বাবা ভাববেন আমি গড়িমসি করছি, তাঁর মত বদলে যেতে পারে।

এখন, কোথায় যাওয়া যায়? কালকেই কোথায় বেরিয়ে পড়তে পারি? জলে-স্থলে নানা রকম অ্যাড্‌ভেঞ্চারের গল্প আমি পড়েছিলুম; কিন্তু আমার সকলের চেয়ে ভালো লেগেছিল আফ্রিকার জঙ্গলে এক বেলজিয়ান শিকারীর অ্যাড্‌ভেঞ্চার। আমাদের দেশেও সুন্দরবনের জঙ্গল আছে—সেইখানে যাবার জন্যে আমার মন লাফিয়ে উঠল। বন্দুক

আমার নেই—বন্দুক ছুঁড়তে জানিও না। তাহলেও জঙ্গলের দেশে গিয়ে কোনো না কোনো রকম অ্যাড্‌ভেঞ্চার যে হয়েই যাবে এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। হয়তো কোনো বন্দুকধারী সঙ্গীই পেয়ে যাবো। তিনি যদি আমায় সঙ্গে করে বনের মধ্যে নিয়ে যান, তাহলে কি আর সেই বেলজিয়ান শিকারীর চেয়ে কম অ্যাড্‌ভেঞ্চার হবে?

গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা খুলে বসলুম। পাতা উল্টে দেখলুম, কালই সুন্দরবনে যাবার একটা স্টীমার পাওয়া যাচ্ছে। উৎসাহের চোটে সেদিন রাত্রে আর আমার ঘুম হল না।

বাবা জানতে চেয়েছিলেন অ্যাড্‌ভেঞ্চারে যেতে গেলে কী কী লাগবে? আমি বললুম, আমার কিছুই লাগবে না। বন্দুক যদি চালাতে জানতুম, তাহলে কথা ছিল—হয়তো বন্দুক একটা নিতুম। তা যখন জানি না তখন একবস্ত্রে বেরিয়ে পড়াই ভালো। তাই বেরিয়ে পড়লুম।

সুন্দরবনের শেষ সীমানার একটি টিকিট সম্বল। এই নিয়ে আমার যাত্রা শুরু। অনেক কাল আগে স্টীমারে করে একবার বটানিকাল গার্ডেনে গিয়েছিলুম। সেবার মনে হয়েছিল, না জানি কত বড় একটা জলযাত্রাই করলুম। কিন্তু এবারে সেবারকার জলযাত্রাকে ছেলেখেলার মত লাগতে লাগল। নদীতীরের কারখানা, কারখানার চিমনি একে একে মিলিয়ে গেল। রইল শুধু দূরে দূরে গাছে-ঢাকা গ্রামের রেখা, মন্দিরের চূড়ো, স্নানের ঘাট। যত এগতে লাগলুম দু-দিকের তীর ততই দূরে সরে যেতে লাগল। সামনের দিকে তাকিয়ে দেখলুম—মনে হল অপার সমুদ্র। সেই সময় আমাদের স্টীমার ডায়মণ্ডহারবারের ঘাটে এসে থামল।

তখন ঠিক বিকেল হচ্ছে। খালাসীরা বললে—আজকের মতো জাহাজ এইখানেই থাকবে।

শুনে কয়েকজন যাত্রী খাপ্পা হয়ে উঠে বললেন—কেন, এখানে তো থাকার কথা নয়। স্টীমার এগোবে না কেন?

একজন খালাসী বললে—কল খারাপ হলে কী করা যাবে? সারা রাত লাগবে কল সারাতে। কালকের আগে জাহাজ নড়বে না।

একজন যাত্রীর বোধহয় যাবার খুব তাড়া ছিল। তাঁর কী রকম সন্দেহ হল খালাসীদের মুখ দেখে, তিনি বললেন—বা রে, আমরা কি টিকিটের পয়সা দিইনি? যেখানে খুশী বাঁধলেই হল? দেখতে চাই আমরা কী কল খারাপ হয়েছে।

একজন মাল্লা এগিয়ে এসে খাটো গলায় বললে—আরে মশায় কেন ঝামেলা করছেন? এই ডায়মণ্ডহারবারে কাপ্তেন সায়েবের শ্বশুরবাড়ি। সেইখানে আজকের রাত্রিটা তিনি কাটাবেন। হাজার চেঁচামেচি করলেও জাহাজ আজ নড়ছে না। কলের ঘরে যান, গিয়ে দেখবেন হাতুড়ি ঠোকা চলেছে—আপনারা কী বুঝবেন তার?

ভদ্রলোকেরা রাগত ভাব দেখিয়ে চুপ করে গেলেন। একটু পরে ইস্ত্রি-করা কাপড় পরে কাপ্তেন সায়েব গট্ মট্ করে নেমে গেলেন জাহাজ থেকে। পাঁচ সাত জন খালাসী দল বেঁধে গল্প করতে করতে নেমে গেল। দু-একজন যাত্রীও নামলেন দেখলুম। তখন আমিও আস্তে আস্তে স্টীমার থেকে নেমে তীরে গিয়ে উঠলুম।

গঙ্গার গা দিয়ে একটি লাল রংএর সরু রাস্তা। জল থেকে মাটিতে নেমে এই প্রথম বুঝলুম গঙ্গাটা এ জায়গায় কী প্রকাণ্ড চওড়া! আসল সমুদ্র যদিও এখান থেকে আরও ত্রিশ মাইল দূরে, কিন্তু যেদিকটায় গঙ্গা গিয়ে সমুদ্রে মিশেছে সেদিকে আকাশ আর জল একেবারে একাকার।

চাপরাসী মত চেহারার একজন লোক আসছিল, বোধহয় সরকারি কাছারি থেকে, তাকে জিজ্ঞেস করলুম, এই লাল রাস্তাটা কতদূর গেছে?

সে বললে—নদীর ধার দিয়ে-দিয়ে বরাবর চলে গিয়েছে—বহুৎ দূর।

আমি বললুম—আচ্ছা এখানকার যে কেল্লা, সেদিকে যাবার কোন্ পথ?

লোকটা বললে—এই রাস্তা ধরে সিধে গিয়ে বাঁ দিকে মাঠের পথে কেল্লা।

আমি লাল মাটির রাস্তা দিয়ে এগোতে লাগলুম। ডায়মণ্ডহারবারের এই কেল্লার কথা আমি পড়েছিলুম আজব-তত্ত্বে। সেই কেল্লার পথে এমন অযাচিত ভাবে যে কোনোদিন এসে পড়ব, তা তখন ভাবিনি। যাতে ফস্ করে বাইরের কোনো জাহাজ বাংলা দেশের মধ্যে ঢুকে পড়তে

না পারে ইংরেজরা তাই সমুদ্রের মুখে এই কেল্লা গড়েছিল। কিন্তু বিশ্ব-যুদ্ধের সময় 'এমডেন' নামে জার্মানদের এক জাহাজের কাপ্তেন সমুদ্রে ঘুরে বেড়াবার পথে বঙ্গোপসাগর দিয়ে গঙ্গার মোহনায় ঢুকে পড়ে-ছিলেন। তিনি যখন তাঁর জাহাজ নিয়ে সাগর দ্বীপকে আক্রমণ করে দ্বীপে নেমে লুঠপাট শুরু করেন তখন ডায়মণ্ডহারবারের কেল্লা থেকে দূরবীণ দিয়ে সবই দেখা গেল, গোলাও ছোঁড়া হল, কিন্তু কেল্লার সামনের কামানের গোলা অতদূর অবধি পৌঁছল না। শুধু দেখাই সার হল। তখন বোঝা গেল যে এখানে কেল্লা রেখে কোনো ফল নেই। সেই থেকে ডায়মণ্ডহারবারের কেল্লা উঠিয়ে সাগরদ্বীপে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এখানকার কেল্লার এখন ভগ্নদশা।

আজব-তত্ত্ব পড়বার পর এই পরিত্যক্ত কেল্লাটা কেমন, তাই দেখবার ইচ্ছে আমার অনেকদিন থেকেই ছিল। রাস্তা দিয়ে খানিকটা হেঁটে বাঁ-দিকের মাঠে দেখলুম একটা সুঁড়ি রাস্তা। মনে হল এটাই হয়তো কেল্লায় পৌঁছবার পথ। কাছে কোথাও একজন লোক দেখতে পেলুম না যাকে ডেকে জিজ্ঞেস করতে পারি। যাই হোক, কিছু দূর এগিয়েই একটা খালের মতো পেলুম। কেল্লার চারিদিকে খাল কাটা থাকে জানি, তাই মনে হল যেন কেল্লার কাছে এসে পড়েছি। খালে জল নেই, কিন্তু বড় বড় ঘাস। আর সেই ঘাসের মধ্যে দিয়ে কালো রংয়ের একটি কি দুটি ক্ষীণ জলধারা ধীরে ধীরে বইছে। চারিধার ঝোপেঝাপে গাছপালায় এমন ঢাকা যে বাইরে থেকে কিছুই বোঝবার যো নেই যে কোনখানে অত বড় দুর্গটা লুকিয়ে আছে। একটা পুরানো রেলিং-ভাঙা কাঠের ব্রিজ চোখে পড়ল। তারই উপর দিয়ে খাল পার হলুম। এবং খানিকটা এগিয়েই বড় বড় খাগড়াবনের মধ্যে একটা মরচে-ধরা লোহার ফটক দেখতে পেলুম।

ফটকটা অল্প একটু ফাঁক করে ভিতরে ঢুকে পড়লুম। বহুদিন আগে এখানে যে একটা ইঁটের রাস্তা ছিল, একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। এখন খোঁচা খোঁচা পাকা ঘাসে সমস্ত রাস্তা ঢেকে গেছে, কেবল তার মাঝখান দিয়ে আঁকাবাঁকা একটা সুঁড়ি পথ—বোঝা যায় যে এখনও এখান দিয়ে মানুষের আনাগোনা আছে। এই রাস্তা ধরে আমি চলতে

লাগলুম। ঘাসের বনের মধ্যে প্রায়ই বড় বড় লোহার গোলা শূন্যে পড়ছিল। একটাকে তোলবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু এত ভারি যে নড়াতে পারলুম না। কামানের গোলা দেখে মনে হল এতক্ষণে সত্যিকারের দুর্গের আওতায় প্রবেশ করেছি।

খানিকটা গিয়ে কতকগুলো নীচু নীচু স্যাঁৎসেতে মাটির ঘর চোখে পড়ল, বোধ হল বারুদের ঘর। এক জায়গায় পাশাপাশি দুটো কবর দেখতে পেলুম—দু-জন সৈন্যের কবর—পাথরের ফলকে তাদের মৃত্যুর ইতিহাস লেখা আছে। পড়ে দেখলুম তারা দুই ভাই, রাত্রের অন্ধকারে তাদের চিনতে না পেরে নিজেদের লোকই গুলি করে ফেলেছিল।

লেখাটা পড়ছি, এমন সময় কোথা থেকে হঠাৎ এক-ঝলক আলো এসে পাথরের উপর ঠিকরে পড়েই মিলিয়ে গেল। চারিদিকে চেয়ে কিছুই দেখতে পেলুম না। জঙ্গলের আড়ালে গাছের মাথার উপর দিয়ে উঁকি দিচ্ছিল একটা বুরুজ, তার চূড়োর কাছে কাঁচের সার্শি দেওয়া একটা ঘর। মনে হল হয়তো সেই সার্শির গায়ে পড়ন্ত সূর্যের আলো লেগে অমন হতে পারে। বুরুজটা দেখে আমার একটু কৌতূহল হল, ভাবলুম, ওটার উপর চড়ে একবার চারিদিক দেখতে পারলে মন্দ হয় না। কিন্তু বুরুজের কাছে যাবার কোনো রাস্তা খুঁজে পেলুম না। চারিদিকই দুর্ভেদ্য জঙ্গলে ঢাকা। তা হোক, অ্যাড্ভেঞ্চার করতে গেলে অমন ঝোপজঙ্গল দেখে পিছোলে চলবে না। আমি ঠিক করলুম, ঝোপ ডিঙিয়ে, কাঁটা মাড়িয়ে, যেমন করে পারি যাবই। এমন সময় দেখি বুরুজের মাথায় দপ্ করে একটা আলো জ্বলে উঠল। কী আশ্চর্য, ওখানে কোনো মানুষ আছে নাকি?

দেখলুম, আলোটা একবার জ্বলছে, একবার নিভছে। এরই আলো ঝিলিক্ মেরে যাচ্ছে কবরের উপর। আলো দেখে বুরুজের উপর চড়ার উৎসাহ আমার আরও বেড়ে উঠল। দেখতে হবে আলোর উৎসটা কি; কেনই বা থেকে-থেকে আলো ফেলা হচ্ছে। কিন্তু জঙ্গল ভেদ করে যাওয়া দেখলুম একেবারে অসম্ভব। একটা কাস্তে থাকলেও না-হয় চেষ্টা করা যেত, শুধু হাতে বৃথাই শ্রম।

ভাবলুম, একটু পিছিয়ে গিয়ে গোল চক্কর মেরে জঙ্গলের দেয়ালে

না প্‌, ফাঁক খুঁজি। এক চুল জায়গা পেলেও তাই দিয়ে ঢুকে পড়ব। যুদ্ধে পিছোতেই একটা সুঁড়ি রাস্তা পেলুম। ধরলুম সেই রাস্তা। দু-পাশে কাঁটা ঝোপ, কোনো রকমে একজন মানুষ হাঁটতে পারে, পা ছড়ে যায় কাঁটার খোঁচায়। তাই ধরে ঘুরপাক খেতে-খেতে চলেছি তো চলেইছি, রাস্তা আর ফুরোয় না। দিকভ্রম হয়ে যাচ্ছে। কেল্লার মধ্যে রাস্তা হারিয়ে গেল নাকি? নাঃ এ রকম করে আর কাঁহাতক চলা যায়? ভাবছি ফিরব, এমন সময়, হঠাৎ সামনে প্রকাণ্ড বুরুজটাকে দেখে চমকে উঠলুম। কিন্তু রাস্তা এবারে একেবারেই ফুরিয়ে গেছে। অল্প একটু দূর, কিন্তু সেটুকু যাবার আর কোনো পথ নেই। পুট্‌টুস গাছের কাঁটা-ঝোপে পথ বন্ধ। রক্তপাতের মায়া করলে আর চলবে না দেখছি। একটা শুকনো ডাল কুড়িয়ে নিয়ে কাঁটা সরাতে সরাতে চললুম। যতো এগোই, ঝোপ ততই ঘন হয়ে আসে। হাত, পা, কাপড়, জামা ছিঁড়ে কুটি-কুটি হয়ে গেল, ভয় হতে লাগল, এইবার চোখ না যায়!

প্রায় পনেরো মিনিট পরে হাঁচড়ে পিচড়ে কোনোরকমে বুরুজের তলায় পৌঁছনো গেল। তলাটায় প্রকাণ্ড চৌকো একটা গাঁথনি, গাছের শিকড়ে আগাগোড়া সমস্ত ফেটে চটা উঠে গেছে। কিন্তু বুরুজে ওঠবার সিঁড়ি? পাছপালা ডিঙ্গিয়ে উল্টো পিঠে গিয়ে দেখি বেশ চমৎকার একটি লোহার গোল সিঁড়ি বুরুজের চুড়ো অবধি উঠে গেছে।

সিঁড়ির তলায় খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়ালুম। কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নেই। আশে পাশে কেউ আছে বলে মনেই হল না। শুধু দূর থেকে একটা ক্ষীণ রান্নার গন্ধ নাকে ভেসে এল। উপরে তাকিয়ে দেখলুম, সেদিকও ফাঁকা। তখন আমি দু-হাতে সিঁড়ি ধরে ধীরে ধীরে উপরে উঠতে লাগলুম। সিঁড়ি বেয়ে চূড়োয় পৌঁছতে বেশী কষ্ট হল না। একটা রেলিং দেওয়া বারান্দা ছিল। সেই বারান্দায় পৌঁছে দেখলুম, সামনেই একটা ঘর, দরজা বন্ধ। দরজার দু-পাশে দুটো জানলার মতো। ডিঙ্গি মারলে জানলার মধ্যে দিয়ে দেখা যায়। আস্তে আস্তে উঁকি মারলুম। শূন্য ঘর—কোথাও কিছু নেই। ঘরের মধ্যে একটা কাঠের দেয়াল, তার গায়ে একটা কাঠের দরজা। যদি

রহস্যজনক কিছু থাকে তো সে ঐ কাঠের দেয়ালের পিছনে। শূন্য ঘরের মধ্যে পা-টিপে ঢুকলুম। তারপর কাঠের বেড়ায় কান রেখে ও-ঘরের শব্দ শোনবার চেষ্টা করতে লাগলুম। কোনো শব্দই নেই। আমি তখন ধীরে ধীরে কাঠের দরজায় হাত দিলুম। একটু ঠেলতেই দরজা খুলে গেল।

একটা তীব্র গ্যাসের আলো। চোখে ধাঁধা লেগে যায়। আলোর কাছে বসে একজন লোক হুম্‌ড়ি খেয়ে কী যেন লিখছে মনে হল। দরজা খোলার শব্দ পেয়েছিল লোকটা, তাইতে পিছন ফিরে তাকালো। তার চেহারা দেখে আমি ভয়ে চীৎকার করে পিছিয়ে গেলুম। লোকটার চোয়ালের উপর থেকে একটা চোখ পর্যন্ত মুখের আধখানা অংশই নেই। জায়গাটা যেন কিসের আঘাতে উড়ে গেছে। ঐ বীভৎস চেহারা দেখেই আমার অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেছে। এ কি ভূত না মানুষ? হঠাৎ লোকটা বিকট শব্দে হো হো করে হেসে উঠল।

আমি মনে সাহস এনে একটা জলচৌকির উপর বসে পড়লুম। লোকটা হেসে বললে—কী ভয় হচ্ছে না কি? ভয়ের কী আছে?

আমি কোনো জবাব দিলুম না

লোকটা তেমনি হেসে আবার বললে—এখানে কী মনে করে আসা হয়েছে?

কী বিশ্রী হাসি! আমি বললুম—জায়গাটা দেখতে এসেছি। এটা কিসের ঘর?

—কিসের ঘর? হুঁ হুঁ অত সহজে জানা যাবে না। ঐ চৌকিতে বসা হোক। আমি ততক্ষণ লিখে নিই। বলে আবার সেই বিশ্রী হেসে লোকটা পিছন ফিরে লিখতে লাগল।

ওর ওই হাসিটা আমার একটুও পছন্দ হচ্ছিল না। অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে কেমন যেন ভয়-ভয় করতে লাগল। লোকটার মতলব-খানা কি? বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। এই অন্ধকারে পথ খুঁজে স্টীমারে ফিরে যেতে হবে তো? ভাবলুম চুপিসাড়ে সরে পড়ি। লোকটা পিছন ফিরে একমনে লিখে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে উঠে কোনো শব্দ না করে কাঠের দরজাটা খুললুম। লোকটা কিছুই টের পেল না।

দরজা ভেজিয়ে দিয়ে পা টিপে টিপে ঘর পেরিয়ে বারান্দা পেরিয়ে সিঁড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। আকাশে দেখলুম চতুর্দশীর চাঁদ উঠেছে। তবু ভালো জঙ্গলের মধ্যে অন্ধকারে হাৎড়াতে হবে না। কিন্তু কী সর্বনাশ! কত উঁচুতে আমি উঠেছি! যদি নামতে যাই, নির্ঘাত মাথা ঘুরে পড়ে যাবো।

কি ভাগ্যিস্ একটু পরে মাথা-ঘুরুনিটা কমে, দৃষ্টিটা সয়ে এলো। মনে হ'ল, কোনো রকমে নামতে পারব। সিঁড়িতে পা বাড়াতে যাবো এমন সময় ঠং ঠং একটা শব্দে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখি একজন লোক খড়ম পায়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠছে—তার হাতে একটা খোলা ছোরা! কী সর্বনাশ! ছোরা! আর নীচে নামা হল না। আমার শরীরের রক্ত হিম হয়ে গেল। এদের ব্যাপারখানা কি তা কিছুই আমার মাথায় ঢুকলো না। আমি পা টিপে টিপে সেই ঘরে ফিরে গেলুম। এবার দরজা খুলতেই লোকটা দেখে ফেলল। বললে—কোথায় যাওয়া হয়েছিল?

আমি জলচৌকিতে বসে আমতা আমতা করে বললুম—এখানেই ছিলুম।

লোকটা আবার সেইরকম হেসে বললে—পালানো হয়-না যেন। একটু খেয়ে যেতে হবে।

রহস্য আরো জটিল হয়ে এল, কিছুই বুঝতে পারলুম না। কিন্তু সেই ছোরা-হাতে লোকটা? সিঁড়ি বেয়ে খটাস্ খটাস্ করে উপরে উঠে আসছিল? হয়তো এখনই ঘরে এসে ঢুকবে! বলতে বলতেই দরজা খুলে গেল। তার মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করল এক মূর্তি। হাতে তার তখনও সেই ছোরাটা।

চোয়াল-ওড়ানো লোকটা চোখটা একটু ঠেরে তাকে বললে—এঁকে একটু মুরগীর জুস্ খাইয়ে দাও।

কথাটা ঠাট্টা না আর কিছু, না কোনে কিছুর ভয়ানক ইঙ্গিত তা বুঝতে পারলুম না। যাই হোক, ছোরাওয়ালা লোকটা দেয়াল-আলমারির মধ্যে ছোরাটাকে রেখে খড়ম খটাস্ খটাস্ করতে করতে নেমে গেল।

খানিক বাদে সে সত্যিই যখন দু-টুকরো রুটি আর এক প্লেট মুরগীর ঝোল আমার সামনে ধরে দিল তখন আমার জিভ দিয়ে জল ঝরছে। কিন্তু ভীষণ সন্দেহ হল এই খাবারের মধ্যে নিশ্চয় কোনো ওষুধ মেশানো আছে। আমি ঘোর সন্দেহে তাঁদের মুখের দিকে তাকাতে লাগলুম।

লিখিয়ে লোকটা বলে উঠল—ভাবা হচ্ছে কী? হয়ে যাক।

ঝোল সামনে নিয়ে আর কতক্ষণ বসে থাকব? লোভও তো এদিকে বেড়ে যাচ্ছে। তখন ভাবনা চিন্তা দূর করে এক নিঃশ্বাসে খাবারটা শেষ করে দিলুম। খেতে খুবই ভালো লাগল। একে খিদে পেয়েছিল, তার উপর গরম গরম মুরগীর ঝোল—একেবারে অমৃতের মতন।

বারান্দায় বেরিয়ে জল দিয়ে মুখ ধুয়ে নিলুম। ঘরে ফিরে এসে দেখলুম লোকটা ঘাড় গুঁজে তখনও লিখে চলেছে। ভাবলুম, এবার আমি কী করব? একটু বসে গল্প করে জানবার চেষ্টা করব লোকটি কী করেন, নাকি না-ঘাঁটিয়ে ভালোয় ভালোয় নিজের পথ দেখব? মুরগীর ঝোলের সঙ্গে কী খাইয়ে দিয়েছে তারই বা ঠিক কি? এমন সময় লোকটি টেবিলের উপর কলম রেখে ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন—এটা কিসের ঘর জিজ্ঞেস করা হচ্ছিল, না?

আমি বললুম—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আলোর ঘর।

বলে তিনি আবার কলম তুলে নিলেন।

আমি ভাবলুম, এই রে, আবার লেখা শুরু হবে; এইবেলা যা পারা যায় জিজ্ঞেস করে নিই। বললুম—আপনি কী করেন?

—আলো দেখাই। বলে তিনি ঘাড় ঘুরিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে লেখার মধ্যে নিবিষ্ট হয়ে গেলেন।

আমি দেখলুম, এ তো আচ্ছা বিপদ। বুঝলুম, আর কিছু জানা যাবে না। বললুম—আজকের মতো আমি তাহলে উঠি?

—বেশ বেশ বড় খুশী হলুম আসায়। একা থাকি, হঠাৎ লোকজন এলে আনন্দ পাই।

খড়মওয়ালাকে আদেশ দিলেন—যাও এঁকে পথ দেখিয়ে দাও।

আমার মনের সন্দেহ তখনও যায়নি। ভাবলুম, আবার ঐ ছোরা-ওয়ালা লোকটাকে আমার পিছনে লাগানো কেন? তাই বললুম—আমি নিজেই পথ চিনে নিতে পারব।

তিনি বললেন—কিছুতেই পারা যাবে না। এই অন্ধকার বনের মধ্যে পথ চেনা খুব শক্ত। রাস্তা সব জঙ্গলে ঢেকে গেছে।

কী আর করি? আগে খড়মওয়ালা, তার পিছনে আমি, লোহার ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে চললুম। খড়মওয়ালা খুব একটা শর্টকাটে আমাকে একেবারে গঙ্গার ধারের রাস্তায় এনে ফেলল। এ রাস্তাটা আগে জানা থাকলে বনের মধ্যে এমন কানামাছির মতো ঘুরতে হত না। মুরগীর ঝোলের মধ্যে কোনো ওষুধ ছিল কি না জানি না, আমার তো সেটা খেয়ে শরীর আগের চেয়ে আরও চাঙ্গা বোধ হতে লাগল। খড়মওয়ালা লোকটার মধ্যেও কোনো কুমতলব দেখতে পেলুম না। কারণ সে আমায় রাস্তায় পেঁাছে দিয়েই চলে গেল। কিন্তু বুরুজের ঘরের ব্যাপারটা মনে হতে লাগল আরো যেন রহস্যজনক।

তাই দাঁড়িয়ে গেলুম। খড়মওয়ালা লোকটা ততক্ষণে পথের বাঁকে মিলিয়ে গেছে। বড় বড় ঝোপের আড়ালে বুরুজটাও এখান থেকে দেখা যায় না। অন্ধকারের মধ্যে আমি সেখানে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় হঠাৎ পায়ের শব্দ পেলুম। এক ভদ্রলোক আমার দিকেই আসছেন।

—কি খোকা, এখানে দাঁড়িয়ে কী দেখছ?

—বেড়াতে এসেছিলুম, এমনি।

—ডায়মণ্ডহারবারেই থাকো বুঝি?

—না, কলকাতা থেকে এসেছি আজ স্টীমারে করে। স্টীমার আজ রাতের মত এখানেই থাকবে। তাই ঘুরতে বেরিয়েছিলুম।

—তাই নাকি? বেশ বেশ। তা এখানকার আলোর ঘর দেখেছ? চলো তোমায় দেখিয়ে দিই।

আমি অবাক হয়ে ভাবলুম, এ তৃতীয় ব্যক্তিটি আবার কে? ঐ রহস্যলোকের তৃতীয় বাসিন্দা নাকি? বললুম—আমি তো এইমাত্র ওখান থেকেই আসছি। তা আপনি কি ওখানে থাকেন নাকি?

—না, না, আমিও কলক্যাতার লোক—ট্রেনে করে সবে এসে পৌঁছলুম। ওখানে আমার একজন পরিচিত লোক থাকেন।

—কে? সেই যাঁর চোয়াল নেই?

হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখেছ তাহলে? ভারি অমায়িক লোক না? খাইয়ে দেননি তোমায়? না খাইয়ে উনি কাউকে ছাড়েন না।

আমি বললুম—চোয়ালটা অমন হল কী করে?

—ভদ্রলোক যুদ্ধে গিয়েছিলেন যে। বোমা লেগে মুখের ঐ অংশটা উড়ে গেছে। ওঁর সঙ্গে একজন বাবুর্চি আছে দেখনি? সে-ই ওঁকে মাঠ থেকে অজ্ঞান অবস্থায় তুলে নিয়ে আসে। সে না থাকলে ওঁর বাঁচবার কোনো আশা ছিল না। আনবার সময় বাবুর্চির পায়ে গোলার চোট লাগে, তাতে দুটো পা-ই ওর কেটে ফেলা হয়েছে। দেখনি কাঠের পা? অথচ ঐ কাঠের পা নিয়ে কেমন সহজ-মানুষের মতো হেঁটে বেড়ায়?

আমি অবাক হয়ে বললুম—কাঠের পা? আমি যে ভাবছিলুম খড়ম। তা ওর হাতে প্রকাণ্ড একটা ছোরা ছিল কেন বলুন তো? আমি তো দেখে ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলুম।

ভদ্রলোক ভুরু কুঁচকে বললেন—ছোরা? ও বুঝেছি। বুঝছো না? হিঁদুর ছেলে হলে হবে কি? যুদ্ধে গেছেন তো—একটু মুর্গী টুর্গী না হলে চলে না। তা তোমায় মুরগীর ঝোল খাওয়াননি?

আমি বললুম—আমি তো ঐ খেয়েই আসছি। কিন্তু আলোর ঘর বললেন, লোকটি বললেন, আমি আলো দেখাই, কাকে আলো দেখান?

ওঃ—এ-ও জানো না? জাহাজকে সিগন্যাল করে আর কি। দ্বীপে কিংবা সমুদ্রতীরে যেমন থাকে। তোমার নিশ্চয় স্টীমারে ফেরবার খুব তাড়া নেই—এই তো সবে সন্ধ্যে, চলো না আর একবার।

আমি বললুম—ভদ্রলোক কী যেন ভীষণ মন দিয়ে লিখছেন। গেলে ওঁকে বিরক্ত করা হবে বোধহয়।

—জীবনের ইতিহাস। ওঁর নিজের জীবনের। যুদ্ধে না-দেখেছেন কী? যা শুনেছেন, শুনলে গায়ে কাঁটা দেয়। বন্দুক কাঁধে লড়াইও

করেছেন—এই সবই লিখছেন। ভদ্রলোক আসলে ছিলেন কোয়ার্টার মাস্টার—রান্নাঘরের চার্জে—রান্নাঘর আর তার সব সরঞ্জাম নিয়ে ঘুরতেন সৈন্যদলের পিছনে পিছনে। তবে লড়াইও করতে হয়েছে ফ্রণ্টে। কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছিল, কত অ্যাড্‌ভেঞ্চারের মধ্যে পড়েছিলেন সব লিপিবদ্ধ করছেন। আমি একদিন এসে খানিকটা শুনে গিয়েছিলুম, আজকে আবার যতটা লেখা হবে শোনাবেন বলেছেন। তাই শোনবার জন্যে আমি কলকাতা থেকে এলুম। চলো না, তোমার যেমন বেড়াবার সখ, তোমার নিশ্চয় ভালো লাগবে।

আমি বললুম—বলেন কি, এমন অ্যাড্‌ভেঞ্চারের গল্প? এ কি আর না শুনে পারি? চলুন তাহলে।

আমাকে আবার ঢুকতে দেখে চোয়াল-ওড়ানো ভদ্রলোক অবাক। এবার আর তাঁকে আগের মতো ভয়াবহ মনে হল না, বরং মনে হল কোনো অ্যাড্‌ভেঞ্চারের নায়ক।

—একে ফেরত নিয়ে এলুম, আপনার লেখা শোনাবার জন্যে।

—কী সৌভাগ্য আমার! একজন শ্রোতা ছিলেন, দু-জন হলেন। ওরে কোথায় গেলি, এঁকে মুরগীর জুস্ দে।

ডাকতে হল না। আমরা যখন সিঁড়ির তলায় তখনই বাবুর্চির সঙ্গে দেখা। সে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এক প্লেট ধোঁয়া-ওঠা মুরগীর জুস্ নিয়ে ঘরে ঢুকল।

আগন্তুক ভদ্রলোকের খাওয়া হয়ে যেতেই গল্প পাঠ শুরু হয়ে গেল। নীরস ছাপার অক্ষরেই এতদিন অ্যাড্‌ভেঞ্চারের গল্প পড়ে এসেছি, এমন টাটকা সরস লেখা স্বয়ং নায়কের মুখ থেকে শুনতে শুনতে মনে হতে লাগল যে জীবন সার্থক হয়ে গেল। সেদিন মাঝখানের খানিকটা অংশ আমাদের শুনিয়েছিলেন—সবে যেটুকু লেখা হয়েছে। সে গল্প যেমন চমৎকার তেমনি লোভনীয়। কেবলই আমার ইচ্ছে হতে লাগল—আমিও কবে এমনি করে আমার অ্যাড্‌ভেঞ্চারের গল্প বলে লোকেদের শোনাতে পারব। এই লেখাই শেষে অনেক দিন পরে আজব-তত্ত্ব আপিস থেকে "মেসোপোটেমিয়ার রণাঙ্গনে বাঙালী রসুইকার" নামে ছাপা হয়।

পাঠ শেষ হবার পর ভদ্রলোক আর আমি বুরুজ থেকে নেমে এলুম। ভদ্রলোক বললেন—চলো তোমায় স্টীমারে পৌঁছে দিয়ে আসি।

আমি বললুম—আপনি ?

তিনি বললেন—আমি তো রাত্রের ট্রেনে কলকাতা ফিরছি।

আমি বললুম—দেখুন, আমার আর সুন্দরবনে যাবার ইচ্ছে নেই।

একে তো যাত্রাভঙ্গ হয়েছে, তার উপর এমন একটা আশ্চর্য অ্যাড্‌ভেঞ্চার আজ হল। বাড়ি গিয়ে বাবা-মাকে গল্প করে বলতে ইচ্ছে করছে। পারলে লিখেও ফেলব। চলুন বরং স্টীমার থেকে আমার সামান্য জিনিস নিয়ে আপনারই সঙ্গে কলকাতায় ফিরে যাই।

॥ ৪ ॥

ডায়মণ্ডহারবার থেকে ফিরে সকলকে আমার গল্প বলতে সকলেই বললেন—হ্যাঁ, এ একটা অ্যাড্‌ভেঞ্চার হয়েছে বটে। শুনতে শুনতে কিছুদিন বেশ গর্ব অনুভব করলুম। কিন্তু তারপর হঠাৎ একদিন মনে হল—নাঃ এ-সব ভুয়ো। বাবা অ্যাড্‌ভেঞ্চারের ব্যবস্থা করে দিলেন, সব জেনেশুনে বেরিয়ে পড়লুম, একবারও গা-ঢাকা দিলুম না, অনিশ্চয়ের পিছনে ছুটলুম না, লুকোচুরি খেললুম না, এ কি অ্যাড্‌ভেঞ্চার হল ? এবারে বেরোতে হবে, কাউকে না বলে, কাউকে না জানিয়ে। মনে মনে মতলব ভাঁজতে লাগলুম কয়েক দিন ধরে।

ইতিমধ্যে আমার এক ভক্ত জুটে গিয়েছিল। আমাদের বাড়ি থেকে ছ-টা বাড়ি ছাড়িয়ে থাকতেন বাবার বন্ধু উকিল-বাবু। আমার কীর্তি-কলাপ পাড়ায় এবং বাবার বন্ধুমহলেও ছড়িয়ে পড়েছিল। সেই সব শুনে উকিলবাবুর ছেলে ববাই আমার মস্ত ভক্ত হয়ে পড়ল। ফাঁক পেলেই চলে আসত আমাদের বাড়ি, আর জামার কোণ ধরে টানতো আর বলতো—বাবুইদা, অ্যাড্‌ভেঞ্চারের গল্প বল না। আমি তাকে খুব গম্ভীরভাবে উপদেশ দিতুম—যাঃ, এই বয়সে অ্যাড্‌ভেঞ্চারের গল্প শুনে কী করবি ? করতে তো পারবি না। শুধু হাত কামড়াতে হবে। আগে বড় হ’ তারপর পড়বি বড় বড় মোটা মোটা বই।

যখন খুব বেশী ধরে পড়ত তখন ববাইকে আমি আজব-তত্ত্ব থেকে পড়া নানা খবর, কিছুটা বাড়িয়ে, কিছুটা রং চড়িয়ে শোনাতুম। আমার নিজের সত্যিকারেব অ্যাড্‌ভেঞ্চারগুলোও বলতুম। ববাইয়ের বেশী ভালো লাগত আমার অ্যাড্‌ভেঞ্চারগুলো শুনতে। হয়তো সুদূরের লোমহর্ষক কথাবলীর চেয়ে ঘরের কাছের জীবন্ত গল্পগুলোর আকর্ষণ বেশী হত। তা ছাড়া জলজ্যান্ত বীরপুরুষকে সামনেই দেখা যেত, হাত দিয়ে ছোঁয়া যেত। ববাইয়ের বয়েস চলছিল সাত। আজব-তত্ত্ব নিয়ে পড়ার ধৈর্য তার ছিল না। আমার মুখ থেকে শোনবারই উৎসাহ ছিল তার বেশী। যতো শুনতো ততো বলতো—ওঃ বাবুইদা, কবে আমি তোমার মতো বড় হব? কবে নিজেই অ্যাড্‌ভেঞ্চার করতে বেরুতে পারব?

উকিলবাবুর খানিকটা ভয় ছিল। তিনি মাঝে-মাঝে বাবাকে বলতেন—ওহে বংশু, তোমার পুত্রটি তো আমার পুত্রটির মস্তিষ্ক চর্বণ করছে।

বাবা বলতেন—কী রকম? তোমার পুত্রই তো শুনি ন্যাওটার মতো ঘুরে বেড়ায় আমার পুত্রের পিছনে।

উকিলবাবু বলতেন—ও একই কথা। ববাই ওর মা-কে কী নোটিস দিয়ে রেখেছে জানো? বাবুই-দার মতো বড় হলেই ও আর বাড়িতে থাকবে না—অ্যাড্‌ভেঞ্চারে বেরোবে। দু-জনের বয়সের যা তফাত তাতেও এমন আশ্চর্য মিল কী করে হল বলো তো?

বাবা বলতেন—নামের মিল। ছেলেকে সামলাতে চাও তো এই-বেলা ববাই বদলে অন্য নাম রাখো।

উকিলবাবু বলতেন—ও বাবা, ও আমার পিতার দেওয়া নাম। ওতে হাত দেয় কে! বলে স্বর্গগত পিতার উদ্দেশ্যে একটা নমস্কার করতেন।

একদিন দুপুরবেলা ছাদে বসে বসে আমার নতুন-ভাবা অ্যাড্‌-ভেঞ্চারটার খুঁটিনাটিগুলো মনের মধ্যে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে নানারকম ভাবে খেলিয়ে খেলিয়ে দেখছি এমন সময় সন্তর্পণে ববাইয়ের

আবির্ভাব। আমার কাছে এসে ঘেঁসে দাঁড়িয়ে বললে—এনেছি বাবুই-দা।

—কী এনেছিস্?

—ঐ যে তুমি যা বলেছিলে। বলে পেটের কাপড়ের তলা থেকে লম্বা-লম্বা তিনটে জিনিস বার করল। একটা লাল, একটা বেগুনি, একটা সবুজ।

তিন টুকরো ছেঁড়া শাড়ির পাড়!

আমার তখন মনে পড়ল ববাইয়ের লাট্টু-ঘোরানো লেত্তিটা ছিঁড়ে গিয়েছিল। বলেছিলুম—ববাই, বাড়ি থেকে তিন রঙা তিন টুকরো শাড়ির পাড় আনিস্, তোকে ময়ূরপঙ্খী লেত্তি বানিয়ে দেব। নতুন লেত্তির চেয়েও ভালো। কবে ঠিক বলেছিলুম, ভুলেই গিয়েছিলুম।

আমি ভুললেও ববাই ঠিক মনে রেখেছিল। বললে—সহজে কি পাওয়া যায় বাবুই-দা? না মা-র কাছে, না দিদির কাছে। যত ছেঁড়া পাড় সব থেকে সুতো বার করে করে কাঁথা আর সুটকেসের ঢাকার ফুল তোলা হচ্ছে। চাইলে তো দেয়ই না, পাড়গুলোকে গুলি পাকিয়ে কোথায় যে লুকিয়ে রাখে খুঁজেই পাই না। আজ সবাই ঘুমোলে কোনোরকমে বার করেছি জিনিসটাকে। দেখচো বাবুই-দা কি ফাস্ ক্লাস রং? কেমন লেত্তি হবে বল তো?

আমি খুব গম্ভীর ভাবে বললুম—ববাই, তোকে লেত্তি করে দেব যখন বলেছি, নিশ্চয়ই করে দেব; কিন্তু এইমাত্র আমি কী করছিলুম বল দেখি?

—দেখলুম তো চুপচাপ বসে আছো আকাশের দিকে তাকিয়ে।

—বাইরে থেকে তাই বটে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে একশ'টা নাটের মুখে একশ'টা বল্টু লাগানোর মতন আমার মন চট্‌পট্ কাজ করে যাচ্ছিল।

—সে কি বাবুই-দা, আমি এসে বাধা দিলুম নাকি?

—তুই আর জানবি কী করে? কাল যে আমি অ্যাড্‌ভেঞ্চারে বেরোচ্ছি। তারই কথা ভাবছিলুম।

ববাই লাফিয়ে উঠল। তার হাত থেকে পাড়-ছেঁড়া মাটিতে পড়ে গেল।

—অ্যাড্‌ভেঞ্চার ? কালই ? আমার যে ভয়ানক যেতে ইচ্ছে করছে !

—তোকে তো আগেই বলেছি। তুই এখনও ছেলেমানুষ। যাই হোক তোকে আমার সেক্রেটারি করে যাচ্ছি। ভালো করে কাজ কর্, দেখবি তুইও একদিন তৈরী হয়ে যাবি।

—সেক্রেটারি ? সে আবার কী ? কী করতে হবে আমাকে বলই না।

—শোন্ তবে বলি। আসল কথা হচ্ছে মুখ বন্ধ করে থাকা। তোকে আমি সব বলবো, তোর ইচ্ছে হবে এক্ষুনি ছুটে গিয়ে সব্বাইকে বলে দি—বাবাকে, মা-কে, তোর দলের ছেলেদের। সেক্রেটারির কিন্তু মুখ খোলবার উপায় নেই—কাউকে কিচ্ছু বলতে পাবি না, সব গোপন রাখবি। এমনি করে তুই হবি আমার সেক্রেটারি, বুঝলি ?

—ভয়ানক শক্ত। যাই হোক তুমি যখন বলছ বাবুই-দা, করতেই হবে।

—আচ্ছা বেশ। শোন্ তাহলে যতটুকু ভেবে রেখেছি। কাল কাউকে না বলে চুপি চুপি বাড়ি থেকে বেরোবো আমি অ্যাড্‌ভেঞ্চারে। কেউ জানতে পারবে না, একমাত্র তুই ছাড়া।

—তারপর ? তারপর ?

—ঐটুকুই ভেবেছি। তারপর আরও ভাবতে হবে।

—ওই যে বললে, নাটবল্টু কী সব ! ওইগুলো বলো না।

—ওইগুলোই তো ভাবছিলুম, এমন সময় তুই এসে পড়লি আর খেই হারিয়ে গেল।

—আচ্ছা তা-হলে লেত্তি থাক বাবুই-দা। তুমি ফিরে এলে হবে। কিন্তু তখন কি আর তুমি লেত্তি করতে চাইবে—তখন তুমি কত বড় লোক !

—দূর, তা কেন ? আমার সেক্রেটারিকে কি আমি ভুলে যাবো ? সেক্রেটারিকে একটা সামান্য লেত্তিও তৈরী করে দেব না ?

—ওঃ বাবুই-দা, আমার ভীষণ যেতে ইচ্ছে করছে তোমার সঙ্গে।

—পাগলামি করিসনে। তুই হলি আমার সেক্রেটারি। তুই গেলে আমার গোপন কথা গোপন রাখবে কে ?

—আচ্ছা বাবুই-দা, তাই ঠিক রইল তাহলে। তুমি এখন ভাবো, আমি চললুম। যাবার আগে আরও যদি কিছু বলবার থাকে শিষ দিয়ে ডেকো, চলে আসবো।

এই বলে ববাই তার ছেঁড়া পাড় গুটিয়ে মহা উত্তেজিত হয়ে মুখটুখ লাল করে ছাদ থেকে নেমে গেল। দেখে মনে হল সে-ই কোনো গোপন অ্যাড্‌ভেঞ্চারে বেরোচ্ছে।

ববাই চলে যাবার পর ভাবতে বসলুম, এবারকার অ্যাডভেঞ্চার কী রকম হবে তারই স্বরূপটা। কিন্তু মাথায় কিছু এলো না। ছাদ থেকে নীচে নেমে গিয়ে আলমারির মাথা থেকে আমার ছেঁড়া 'আটাশে'-টা টেনে বার করলুম। তার মধ্যে ভরা ছিল পুরোনো আজব-তত্ত্ব। সেগুলোকে আলমারির মাথায় রেখে আটাশেটাকে ধুলো ঝেড়ে পরিষ্কার করলুম। তারপর যে-কটা জিনিস মনে হল অ্যাড্‌ভেঞ্চারে কাজে লাগতে পারে তাদের ভরে ফেললুম বাক্সটার মধ্যে। যাত্রার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়ে গেল।

শেষে আবার ভাবতে বসলুম। কিন্তু যে-কে সেই। কোনো প্ল্যানই মাথায় এলো না। আজব-তত্ত্বে যে-সব অ্যাডভেঞ্চারের কথা পড়েছি সেগুলো আমার পক্ষে অনুপযুক্ত। কারণ সাইবেরিয়া বা দক্ষিণ মেরু যাবার টাকা পাবো আমি কোথায় ? আর ঐ সব দূর-দেশে পৌঁছতে না পারলে আর ঐ সব দেশের ভাষা না জানলে ঐ রকম এ্যাড্‌ভেঞ্চার করবই বা কী করে ? আমাকে করতে হবে আমারই মতো এ্যাড্‌ভেঞ্চার। কিন্তু কী করব সেটাই ভেবে পাচ্ছি না। দূর হোক গে ছাই, আর ভাবতে পারি না। আটাশেটা নিয়ে বেরিয়ে তো পড়া যাক চুপিচুপি, তারপর অ্যাড্‌ভেঞ্চারের পথ আপনিই খোলা হয়ে যাবে। যাবার আগে সেক্রেটারিকে শুধু একবার শিষ দিয়ে জানিয়ে দিয়ে যাবো যে চললুম।

পরদিন সকাল বেলা ভাত খাওয়া সেরে যখন দেখলুম বাড়ির সকলে যে-যার তালে ব্যস্ত, আমার দিকে নজর দেবার কারো ফুরসত নেই, সেই সময় চুপিসাড়ে বেরিয়ে পড়লুম আমার আটাশেটা বগলের তলায় আঁকড়ে ধরে। ববাইদের বাড়ির সামনে দিয়ে যখন যাচ্ছি, দেখি ওদের

বৈঠকখানা ঘরটা খোলা, সেখানে অনেক লোক। তাই আর শিষ দেওয়া হল না।

ঘুরতে ঘুরতে শেয়ালদা স্টেশান। দেখলুম একটা ট্রেন বর্ধমান যাবার জন্য তৈরী। টিকিট কিনে উঠে পড়লুম তাতে। ট্রেন ছেড়ে দিল।

লম্বা একখানা কামরা। যাত্রীতে ভরা। বেশীর ভাগই বড় বড় খালি ঝুড়ি নিয়ে চলেছে। এরা বোধহয় শেয়ালদায় এসেছিল ঝুড়ি-ভরা তরকারি নিয়ে। সেইসব কলকাতার বাজারে বেচে এখন স্বগ্রামে ফিরে চলেছে। গাড়ির এককোণে কয়েকজন ভদ্রলোক নিজেদের মধ্যে গল্পে মশগুল। অপর এককোণে আরও কয়েকজন ভদ্রলোক জানলার বাইরের দিকে চেয়ে চুপটি করে বসে আছেন।

প্রত্যেক স্টেশানে থামতে থামতে গাড়ি চলেছে। কেউ উঠছে, কেউ নামছে। রোদ বেড়ে উঠতে আমার তেস্টা পেয়ে গেল। কী একটা স্টেশান, নাম জানি না, সেখানে দেখি ডাব বিক্রি হচ্ছে। নামলুম, কিনবো বলে। ডাবওয়ালা যখন আমার ডাবের মুখ ছুলে দিচ্ছে তখন পিছনে চাপা অথচ উত্তেজিত স্বরে ফিসফিস কথাবার্তা। কান পেতে শুনলুম।

—কোনো ওজুহাত শুনবো না। যা বলছি করুন। এখনই গাড়ি ছেড়ে দেবে।

—আরে মশাই এখন আমি বাড়ি গিয়ে ভাত খাবো—এই কামারকুণ্ডুতেই আমার বাড়ি। কত বেলা হয়েছে দেখছেন ?

—তা হোক। শুনুন তবে, আমরা পুলিসের লোক। এই দেখুন ব্যাজ। এই কামরার প্রত্যেকের টিকিট চেক করুন। বিশেষ করে ঐ পশ্চিম কোণের জানলার ধারে যে তিনজন ভদ্রবেশী লোক আছেন তাঁরা কোথায় যাচ্ছেন, চুপি চুপি আমাদের জানানো চাই।—এই ছোকরা, তুমি কী শুনছ ? যাও না গাড়ি ছাড়ছে, উঠে পড় গাড়িতে! বলে আমায় এক ধমক লাগালেন। আমি ডাব হস্তে চক্ষু বিস্ফারিত করে কথাবার্তা শুনছিলুম। আমাদের কামরায় যে তিনজন ভদ্রলোক এক কোণে বসে নিজেদের মধ্যে গল্প করছিলেন এঁরা তাঁরা। কামারকুণ্ডু

স্টেশানে এক অনিচ্ছুক টিকিট-চেকারকে ধরেছেন তাঁদের কামরার প্রত্যেকের টিকিট চেক্‌ করতে ওঠবার জন্যে।

অনিচ্ছুক চেকার অগত্যা রাজী হলেন। আমরা উঠতেই গাড়ি ছেড়ে দিল। আমি সেই যে তিনজন, যাঁরা জানালার ধারে মুখ বাড়িয়ে বসেছিলেন, যতটা সম্ভব তাঁদের কাছে গিয়ে বসলুম। টিকিট-চেকার একে-একে সকলের টিকিট চেক্‌ করতে লাগলেন। চাষীদের অনেকেরই টিকিট ছিল না—তাদের সঙ্গে ঝগড়া হল, দণ্ড আদায় হল; যাদের কাছে আদায় হল না তাদের বলা হল, সামনের স্টেশান মধুসূদনপুরে নামিয়ে দেওয়া হবে। আমি বর্ধমানের টিকিট দেখালুম। অবশেষে সেই তিনজন লোকের কাছে গেলেন চেকার।

টিকিট হাতে নিয়ে উল্টে পাল্টে দেখে বললেন—এ তো কিউলের টিকিট, আপনারা কোথায় যাচ্ছেন?

—কিউল।

—তা হাওড়া দিয়ে গেলেই পারতেন। হাওড়া দিয়ে কিউলের ভালো ভালো গাড়ি ছিল। এ-গাড়ি তো বর্ধমানে গিয়েই খতম!

—তা হোক. আমরা গাড়ি বদলে নেব।

চেকার আর কিছু বললেন না—চলে গেলেন। যাঁরা নিজেদের পুলিসের লোক বলেছিলেন তাঁরা সবই শুনতে পেলেন, কাজেই চেকারকে কাছে ডেকে পাঠিয়ে অপরপক্ষের অযথা সন্দেহ বৃদ্ধি করার প্রয়োজন বোধ করলেন না।

গাড়ি এসে মধুসূদনপুরে থামতে চেকার যে ক'জন যাত্রা পয়সা দেয়নি তাদের সকলকে জোর করে নামিয়ে দিয়ে নিজেও নেমে গেলেন। বুঝলুম এইসব যাত্রীরা পরের গাড়িতে আবার বিনা-টিকিটেই বর্ধমানের দিকে যাত্রা করবে আর চেকারমশায় ডাউন গাড়িতে কামারকুণ্ডুতে ফিরে যাবেন ঠাণ্ডা মেরে যাওয়া ভাত বেড়ে খেতে। গাড়ি ছাড়তে দেখলুম চেকার-বাবু পুলিসের লোকদের দিকে একবার চকিতে তাকিয়ে ফিক্‌ করে হেসে দিয়ে গেলেন।

একটানা গতিতে গাড়ি চললো। আমি ভাবতে লাগলুম—কারা এরা? কাদের পিছনে পুলিস ধাওয়া করেছে? যাচ্ছে তো আপাতত

কিউল। পুলিসও কি অতদূর যাবে? তারপর? আচ্ছা ধরা যাক লোকগুলো যদিও ভদ্র পোশাকে যাচ্ছে, কোনো কু-মতলবে চলেছে অথবা কোনো কু-কাজ করে পালাচ্ছে। কোন্‌টে? পুলিস নিশ্চয় জানে অথবা সন্দেহ করে। আমায় কি বলবে না? আমি নিশ্চয় পুলিসকে কোনো না কোনো উপায়ে সাহায্য করতে পারি। কিন্তু পুলিস আমায় বিশ্বাস করবে কি? চেনেই না তো। বাবার সঙ্গে অবশ্য একজন পুলিস ইন্‌স্‌পেক্টারের আলাপ আছে, যিনি আমায় গারদে নিয়ে গিয়ে গলা-কাটার এক্সপেরিমেণ্ট করেছিলেন, তাঁর কথা বললে এঁদের কি আমার উপর বিশ্বাস বাড়বে? আমায় দলে নেবেন? কে জানে, উল্টো ফলও হতে পারে। সব ভেবে ঠিক করলুম কিছুই বলব না কাউকে। যেমন যাচ্ছি তেমনি যাই, শুধু চোখ কান খোলা রেখে।

বর্ধমান এসে পৌঁছোতে গাড়ি খালি হয়ে গেল। সবাই আমরা নেমে পড়লুম। দেখলুম পুলিসের বাবুদের মধ্যে দু-জন বাইরে চলেছেন। একজন রয়ে গেলেন বোধহয় অপরাধীদের উপর চোখ রাখবার জন্যে। আমি অন্য দু-জনের পিছু নিলুম। যা ভেবেছিলুম তাই। এঁরা দেখি থার্ড ক্লাস বুকিং আপিসের দিকে গেলেন। আমিও গেলুম।

—তিনখানা কিউল।

ওঁদের টিকিট কেনা হয়ে যেতে আমি বললুম—একখানা কিউল।

শুনে পুলিসের লোকেরা থমকে দাঁড়ালেন। আমার টিকিট কেনা হয়ে যেতে বললেন—কোথায় যাচ্ছ হে ছোকরা?

আমি বললুম—কেন, কিউল?

—তা তো বুঝলুম, এই বর্ধমানে এলে, আবার কিউল যাচ্ছ—ছেলেমানুষ—ব্যাপারখানা কি?

আমি বললুম—আপনারাও তো তাই। কিউলে নিশ্চয় আপনাদের বাড়ি নয়, তা হলে বর্ধমানের টিকিট কিনতেন না।

একজন বললেন—ও হে সরল, এ ছোকরা বড় ডেঁপো। যে রকম ফেউয়ের মত লেগেছে, একে সরানো দরকার।

সরলবাবু বললেন—দাঁড়াও যতীন, একটু বুঝে নিই। বলে আমার দিকে ফিরে বললেন—তোমার নাম কি?

—শ্রীবাবুই সরকার।

—বাবার নাম কি?

—শ্রীবংশলোচন সরকার।

—বাড়ি কোথা?

—কলকাতা, ৭ নম্বর শিবু সমাদ্দারের স্ট্রীট।

—যাচ্ছ কোথায়?

—যাচ্ছিলুম বর্ধমান, এবার যাবো কিউল।

—কিউলে কে আছে?

—কেউ নেই।

—তবে যাচ্ছ কেন?

—দেখতে।

—কী দেখতে?

—আপনারা কী করেন—কেমন করে অপরাধী ধরেন।

—ও, তবে তুমি সব জেনেছ?

—ওই যে কামাবকুণ্ডুতে ডাব খেতে-খেতে শুনলুম। তারপর টিকিট-চেকার কেমন কায়দা করে জানিয়ে দিয়ে গেল অপরাধীরা কিউলে যাচ্ছে। সরলবাবু, আমাকে দিয়ে আপনাদের কোন কাজ হবে না?

যতীনবাবু আবার ধমক দিয়ে বললেন—থামো হে ছোকরা। তুমি কেটে পড়ো তো। আমাদের কাজে বাধার সৃষ্টি করো না।

সরলবাবু বললেন—দাঁড়াও যতীন, এর উপর অতটা নির্দয় হবার দরকার নেই। আমি আরও কয়েকটা প্রশ্ন করি।

—আচ্ছা শুনি, বর্ধমানে তুমি যাচ্ছিলে কেন?

—যাচ্ছিলুম অ্যাডভেঞ্চারের খোঁজে।

—অ্যাডভেঞ্চার? কিসের অ্যাডভেঞ্চার?

—এমনি! যদি কিছু হয়।

—ওঃ, বাড়ির লোকে জানে তুমি বর্ধমানে যাচ্ছো?

—কেউ জানে না। শুধু আমার একজন সেক্রেটারি জানে, তার নাম ববাই। বয়েস সাত।

যতীনবাবুর আর ধৈর্য রইল না। বললেন—ও হে সরল, এ ছোকরা দারুণ ফাজিল। বিদায় কর একে। এ আমাদের ফাঁসাবে।

সরলবাবু আমার কথায় প্রায় হেসে ফেলেছিলেন। বললেন—দেখ বাবুই। পুলিসের লোক হিসেবে আমাদের উচিত এখন তোমার বাবাকে টেলিগ্রাম করা যে তুমি পালিয়ে এসেছ। যাই হোক, আপাতত তা করব না, শুধু তোমার উপর চোখ রাখব। তারপর কিউলে পৌঁছে দেখা যাবে। আর দেখ, ঐ লোকগুলো যেন ঘুণাক্ষরেও জানতে না পারে যে আমরা পুলিসের লোক।

আমি বললুম—আমি কি ওদের একটু কাছাকাছি থাকলে আপনাদের সুবিধে হয়? যেমন ধরুন, ওরা নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি করছে সেটা সুবিধে মতো আপনাদের জানিয়ে দিতে পারবো।

—না এ-সব বিষয়ে তোমার ট্রেনিং নেই—তুমি চুপচাপ থেকো। তোমার কিছু করবার দরকার নেই।

শুনে আমি ক্ষুণ্ণ হলুম। বাড়ির উপর রাগ হল। আমাদের লেখা-পড়া শেখাবার জন্যে বাড়ির লোকের এত মাথাব্যথা, অথচ এই ট্রেনিং-গুলো কেন যে দেন না বুঝি না!

যতীনবাবু তখন টেলিগ্রাফ অফিসের কাছে গেলেন। সরলবাবু দাঁড়িয়ে রইলেন। দেখলুম যতীনবাবু টেলিগ্রাফ ফর্ম-এ কী-সব লিখে জানালা গলিয়ে কেরানীবাবুকে দিলেন।

আমি সরলবাবুকে জিজ্ঞেস করলুম—উনি বুঝি কিউলে টেলিগ্রাম করছেন পুলিস মোতায়েন করতে? ঐখানেই ওদের অ্যারেস্ট করবেন?

সরলবাবু আমার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে বললেন—তোমার সাংঘাতিক বুদ্ধি তো? নাঃ বড় হয়ে নির্ঘাত তুমি পুলিস-অফিসার হবে।

আমি বললুম—না সরলবাবু, আমি হতে চাই অ্যাড্‌ভেঞ্চারার; তাতে আরও বেশী বুদ্ধির দরকার।

যতীনবাবু টেলিগ্রাম পাঠিয়ে ফিরে এলেন। আমরা আবার প্ল্যাট-ফর্মে ফিরে গেলুম। সেখানে দেখলুম মালপত্র নিয়ে অপরাধী তিনজন গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছে। একটু দূরে তৃতায় পুলিসের ব্যক্তি তাদের উপর লক্ষ্য রেখেছেন।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই কিউলের গাড়ি এসে গেল। হাওড়া থেকে আসছে। কী ভীড়! প্রত্যেক কামরাতেই লোক ঠাসা। আমরা লক্ষ্য রেখেছিলুম, সেই তিনজন লোক কোথায় ওঠে। একটা থার্ড ক্লাস কামরা থেকে পাঁচ সাত জন লোক নেমে যাচ্ছিল, তারা সেই দরজার দিকে ছুটল। আমরাও ছুটলুম।

তিনজনের প্রত্যেকের দু-হাতে কিছু কিছু করে মাল। টিনের সুটকেস, লোহার বাক্স, পুঁটলি বিছানা। একজনের হাতে একটা চামড়ার আটাশে, ঠিক আমারটির মতো। একই সাইজ, একই রং। আমারটা শুধু পুরোনো এবং ময়লা ; ওরটা পুরোনো, ময়লা এবং পোকায় খাওয়া।

কেন জানি না, আমার মনে হল,—পুলিস তো আমায় কিছুই করতে দিচ্ছে না, নিজে থেকে অন্তত আমি একটা কাজ করব। কোনো এক সুযোগে আমার আটাশেটার সঙ্গে ওদের আটাশেটা বদলে ফেলব। দেখা যাক তার ফলে যদি কিছু ঘটে যায়।

এই মনে করে আমি ওদের সামনেব বেঞ্চটায় বসলুম। ট্রেন ছেড়ে দিল। অনেক দূব যাবে এবাব এ গাড়ি। ভোর চারটের সময় পৌঁছোবে কিউল। সামনে সারা রাত। গাড়ির ঝাকুনিতে আমার মাথা নড়ছে আর আমি ক্রমাগত ভেবে চলেছি কী করে আটাশেটা বদলে ফেলা যায়। ওদের মালগুলো বাঙ্ক-এর এক কোণে জড় করা। একটা পুঁটলির উপর আব একটা পুঁটলি। তাব পাশে খাড়া করা একটা চটের থলি—তার মধ্যে থেকে মূলো শাক উঁকি দিচ্ছে। তার পাশে একটার উপর একটা টিনেব সুটকেস আব তার উপর শোয়ানো আটাশেটা। ওরা যদি একটু অন্যমনস্ক হয় কিংবা ঘুমিয়ে পড়ে তাহলেই আমি জিনিস-টাকে সবাতে পারি। দিব্যি গল্প করে যাচ্ছে তিন জনে মিলে।

আমার মনে পড়ল, আজব-তত্ত্বে পড়া এক সায়েবেব অ্যাড্‌ভেঞ্চাবের কথা। ইকুয়েডাবের কোন এক অজানা কোণে তিনি ধরা পড়েছিলেন দুর্বৃত্তদের হাতে। তারাও ছিল তিনজন। সায়েবকে ধরে এক বলদের গাড়িতে চাপিয়ে দশ মাইল দূরে তাদেব গ্রামে নিয়ে যাচ্ছিল। উদ্দেশ্য বোধ হয় সায়েবকে গ্রাম দেবতার কাছে উৎসর্গ করে সায়েবকে কাটবে

আর সাহেবের তাজা রক্তে ধুইয়ে দেবে দেবতার পা। সাহেবের পকেটে ছিল ঘুম-পাড়ানো লজেঞ্চুস। মিষ্টি খেতে। দুর্বৃত্ত বন্য জাতির মানুষরা মিষ্টি খাবার নামে পাগল। সাহেবের হাত থেকে মিষ্টি নিয়ে খেয়ে যেই ঘুমিয়ে পড়ল, সাহেব অমনি তাদের ঘুমন্ত দেহ রাস্তার ধারে ফেলে দিয়ে রয়েল-গাড়ি নিয়ে দে চম্পট।

দুঃখ হতে লাগল ঘুম পাড়ানো লজেঞ্চুস নিয়ে বেরোইনি বলে। অগত্যা কখন তারা আপনি স্বাভাবিক ভাবে ঘুমিয়ে পড়ে তারই জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। তা সে যত রাতই হোক। আজকের রাতে আমার ঘুমোলে চলবে না। জেগে জেগেই যাবো। চোখ বুজতে পারি, কিন্তু এক চিল্‌তে ফাঁক করে রাখবো, যাতে দেখতে পাই সব।

একটানা গতিতে গাড়ি চলেছে। গাড়ির অন্য অংশে ডিটেকটিভরা আছেন। তাঁরা কী করছেন জানি না। হয়তো দূর থেকে অপরাধীদের উপর চোখ রেখেছেন, পাছে মাঝের কোনো স্টেশানে তারা মালপত্র নিয়ে নেমে পড়ে। আমি মোটের উপর পিছন ফিরে তাদের দিকে তাকাচ্ছি না পাছে সন্দেহ করে। কিন্তু অপরাধীদের দিকে দেখতে দেখতে আমার মনে হতে লাগল, ওরা কিছু একটা আঁচ করেছে। কারণ খুব সন্তর্পণে মাঝে মাঝে তারা ডিটেকটিভদের দিকে দেখছে কেন? নিজেদের মধ্যে কথাও বলছিল যেন।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে এল। সন্ধ্যের একটু পরেই কিন্তু একটা ঘটনা ঘটল। একটা স্টেশান থেকে সবে ট্রেনটা বেরোতে যাবে অমনি হৈ হৈ রব—গেল গেল, থামাও থামাও, এই রকম শব্দ। কেউ চেন্‌ও হয়তো টেনে থাকবে কিংবা চীৎকারের শব্দ ড্রাইভারের কানে পৌঁছে থাকবে। ট্রেন থেমে গেল। প্ল্যাটফর্মে ভীষণ চাঞ্চল্য। শোনা গেল একজন লোক নাকি কাটা পড়েছে চাকার তলায়। সবাই ঝুঁকে পড়ল দেখতে। আমার সামনের তিনজনও। দু জন প্ল্যাটফর্মে নামল, তৃতীয় জন দরজা ধরে উঁকি মেরে দেখতে লাগল। ডিটেকটিভরা তো নেমেই গিয়েছিলেন।

আমি মাথা ঠিক রেখেছিলুম। নজর রেখেছিলুম, কে কোথায় যায়। দেখলুম, এই সুযোগ। কামরা খালি হয়ে যেতেই ধীরে উঠে গিয়ে

আমার আটাশের সঙ্গে ওদের আটাশে বদলে ভালো-মানুষের মতো মুখ করে বসে রইলুম। কেউ কিছু জানতে পারল না। আমার কাজ হয়ে গেল। এখন ওদের কেউ কোনো কারণে যদি আমার আটাশেটা না খোলে তবেই রক্ষে।

ক্রমে রাত হয়ে এল। কোন এক স্টেশানে এক দল যাত্রী উঠল। সকলেরই ঘুম পেয়ে আসছিল। কিন্তু এই নতুন যাত্রীদলের চলা-ফেরা মাল-ওঠানো সীট দখল করা ইত্যাদির সজীবতায় এবং সর্বোপরি তাদের কলকল ভাষায় কামরা মুখর হয়ে ওঠায় ঝিম্ লাগা যাত্রীরা আবার সজাগ হয়ে উঠল। নানা রকম কথার টুকরো কানে আসতে লাগলো বটে কিন্তু সব সময় লক্ষ্য করছিলুম, আমার সামনের তিনজন যাত্রী যেন একেবারে বোবা। বহু সময় পরে পরে ফিস ফিস করে অত্যন্ত নিঃশব্দে নিজেদের মধ্যে কী যে কথা বলছিল একটুও কানে আসছিল না। মনে হচ্ছিল, ওরা টের পেয়েছে যে ওদের পিছে ফেউ লেগেছে। হয়তো পালাবার মতলবই আঁটছিল। কে জানে?

আমি তাই ঠিক করলুম, আজ কিউল পোঁছোনো পর্যন্ত কিছুতেই ঘুমোবো না। ক্রমে ক্রমে যাত্রীদের বাক্যালাপ কমে এলো। কমতে কমতে শেষে একেবারেই নিস্তব্ধ হয়ে গেল কামরা। শুধু হলদে রংয়ের ফিকে আলোয় দেখা যেতে লাগল সারি সারি মানুষের মাথা গাড়ির ঢুলুনির তালে হেলছে আর দুলছে। জানলার বাইরে ঘনকৃষ্ণ অন্ধকার। তারই মধ্যে দূরে কোথা থেকে হঠাৎ এক-আধটা মিটমিটে আলো দেখা দিয়েই মিলিয়ে যাচ্ছে। জানলার মাথার কাছটায় সামান্য একটু ফিকে আকাশ—দু-একটা তারা। ব্যাস, এই ছাড়া আর কিছু নেই। আমি থেকে-থেকে সামনের যাত্রী তিনজনের দিকে তাকাচ্ছি আর গুনছি—এক দুই তিন। খেয়াল রাখছি তিন জনেই ঠিক আছে কি না, তারপর আবার জানলার বাইরের অন্ধকারে দৃষ্টিকে ডুবিয়ে দিচ্ছি।

এক দুই তিন। ফাঁক। আবার এক দুই তিন। কোথায় যেন পড়েছিলুম একে তিন তিনে এক। তার মানে কি তিনও যা একও তাই? এক দুই তিন। তিন-ঠেঙ্গা একটা লম্বা লোক যেন হেঁটে যাচ্ছে।

সরু সরু তার তিনটে পা বকের প্যায়ের মতো চলেছে আর আমি গুনছি এক দুই তিন। কোনটা এক নম্বর পা, কোনটা দু নম্বর তিন নম্বর, গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। প্রাণপণে চেষ্টা করছি হিসেব ঠিক রাখার। গুনে চলেছি—এক দুই তিন। তারপর তিনটে পা-ই এক হয়ে গেল! মানুষটাও মিলিয়ে গেল। শুধু জেগে রইল ঠ্যাংটা···গভীর স্বপ্নের মধ্যে আমি ঢলে পড়লুম।

কতক্ষণ পরে জানি না চমকে জেগে উঠেছি। আলস্যে ভরা গা। চোখের পাতা ভারি। বুঝলুম বেশ লম্বা এক-ঘুম হয়ে গেছে।

প্রথমেই চোখ পড়ল সামনের তিনজন যাত্রীর উপর। নাঃ, তিনজন অপরাধীই আছে। কেউ পালায়নি—জেগে বসে আছে। তারপর আস্তে আস্তে তাদের বাঙ্কের উপর রাখা মালের দিকে চোখ ফেরালুম। সে দিকে দেখেই আমার চক্ষু স্থির হয়ে গেল। কী সর্বনাশ আটাশেটা যেখানে ছিল সেখানে আর নেই! কোথাওই নেই। পিছনের বাঙ্কে যেখানে আমার আটাশে, অর্থাৎ তাদের আটাশেটা রেখেছিলুম, সেই দিকে তাকালুম—দেখলুম সেটা ঠিক আছে। তবে কী হল? ওদেরটা গেল কোথায়? ডিটেকটিভরাও দেখলুম অকাতরে ঘুমোচ্ছেন। গাড়ির অন্য সব যাত্রীরাও কেউ ঘুমোচ্ছে, কেউ ঢুলছে। শুধু ঐ তিন জন অপরাধীই জাগ্রত। আমার মনে হল, কোনো এক স্টেশানে, ওদের দলের কারুর হাতে আটাশেটা চালান করে দিয়েছে। অন্য মালগুলোর উপর চোখ বুলিয়ে গেলুম। সেগুলো মনে হল সব ঠিক আছে। শুধু ঐ আটাশেটাই নেই—অদৃশ্য হয়েছে।

কিন্তু আর কিছু করবার নেই। চুপচাপ বসে রইলুম। সারা ট্রেন ঢুলতে লাগল। শুধু জেগে রইল তিনজন অপরাধী আর তাদের অতন্দ্র প্রহরী আমি।

তখন বোধহয় তিনটে হবে। একটা স্টেশানে গাড়ি ঢুকতেই চা-ওয়ালার দল জানলার বাইরে—চা—চা—করে চীৎকার জুড়ে দিল। সেই শব্দে উঠে পড়লেন ডিটেকটিভের দল। গাড়ির প্রায় সকলেই জেগে উঠল।

—কোন স্টেশান এটা? কোন স্টেশান?

—অভয়পুর।

—এই, চা-ওয়ালা গেল কোথায়?

—এই চা, ইধার আও।

—গরম আছে তো?

—দেখুন বাবু ধোঁয়া উঠছে—মুখ পুড়ে যাবে।

—দাও তিন পেয়ালা।

—পয়সা দিন বাবু—ও গাড়িতে ডাকছে।

—আরে ভাই এ-গাড়ি আগে শেষ করো—আমায় দাও দু-টো।

ডিটেকটিভরা চা খেয়ে চাঙ্গা হয়ে বসলেন। গাড়ি ছেড়ে দিল।

তারপর আর এক ঘণ্টা পরে কিউল জংসানে এসে গাড়ি ঢুকল। প্রথমেই লাফিয়ে উঠলেন ডিটেকটিভরা। সবার আগে দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন। কয়েকজন যাত্রী নেমে যাবার পর গা-মোড়া দিয়ে অপরাধীরাও উঠলো। তাদের মালগুলো তুলে ঝুলিয়ে নিল দু-হাতে। যেমন ওঠবার সময় কুলি নেয়নি, এবারেও নিলে না। আমি আটাশেটা হাতে নিয়ে চুপিসাড়ে তাদের পিছনে পিছনে নেমে পড়লুম।

প্ল্যাটফর্মে সব ব্যবস্থা ছিল। আমি একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলুম, কী হয়। লোকগুলির টিকিট দেখানো হয়ে যেতেই ডিটেকটিভদের একজন এগিয়ে এসে বললেন—আপনারা একটু আমার সঙ্গে এই ঘরে আসুন, বলে তাদের একটা ঘরে নিয়ে গেলেন। ঘরের মধ্যে তখনও অন্ধকার। টিম্‌টিমে একটা তেলের আলো জ্বলছিল। লোকগুলি বিনা বাক্যব্যয়ে ঘরে ঢুকল, পুলিসের বাবুর ব্যাজ্ দেখল, তারপর বিনা দ্বিধায় তাদের বাক্স, পুঁটলি, ব্যাগ, সব একে-একে খুলে দেখাতে লাগল। আমি দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে সব দেখলুম। এক দল সেপাই তৈরী ছিল, যদি কিছু গোলমাল হয়, যদি কেউ পালাতে চায়, তারা থামাবে। কিন্তু কিছুই হল না। অপরাধীদের বাক্স থেকেও ডিটেকটিভরা যা খুঁজছিলেন তার কিছুই পেলেন না। এ ওর মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগলেন।

এইবার আমার পালা। ধীর পদে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে সেই

মলিন আলোয় আটাশেটা তুলে ধরে বললুম—এইটা এবার খুলে দেখুন তো।

লোক তিনটের চেহারা তখন দেখবার মতো। চোখ হাঁ হয়ে গেছে—যেন ভোজবাজি দেখছে। একজন ওরই মধ্যে লাফিয়ে উঠে ঝাঁ করে আমার হাত থেকে আটাশেটা কেড়ে নিয়ে পালাবার চেষ্টা করল। ধাক্কা খেয়ে আমি পড়ে গেলুম। আটাশেটা ছিটকে বেরিয়ে গেল। পুলিসের সেপাইরা লাঠি হাতে দরজা আড়াল করে দাঁড়াল। ধুলোটুলো ঝেড়ে মাটি থেকে উঠে দেখি অপরাধীদের হাতে হাত-কড়া পড়ে গিয়েছে। ডিটেকটিভরা আটাশেটা খোলবার চেষ্টা করছেন।

তালা ভেঙে ফেলা হল। তালা খুলতেই দেখা গেল থরে থরে সাজানো সোনার গয়না।

সরলবাবু এগিয়ে এসে আমায় দু-হাতে জড়িয়ে ধরে বললেন—তোমার বুদ্ধিতেই এটা হল ভাই। কী করে করলে বল তো ?

আমি বললুম—সে পরে বলব। এখন বলুন, ট্রেনিং না থাকলেও পুলিসকে সাহায্য করা যায় কিনা ?

যতীনবাবু জবাব দিলেন। বললেন—তুমি তো ভাই সেল্‌ফ্‌-ট্রেন্‌ড্‌ দেখছি !

শুনলুম কলকাতার এক বিখ্যাত গয়নার দোকানে দু-দিন আগে এক ডাকাতি হয়। বহু গয়না লোপাট। পুলিসের খবর ছিল ডাকতরা বিহারের লোক, মাল নিয়ে কলকাতার বাইরে পালাবে। বিহারগামী গাড়িগুলোর উপর পুলিস দু-দিন ধরে নজর রাখছিল। শেয়ালদা থেকে বর্ধমানে গিয়ে গাড়ি বদলে বিহারে পালাবে এ সম্ভাবনাও তারা ধর্তব্যের মধ্যে রেখেছিল। তাতেই ধরা পড়ল এই দলটা। বামাল যে ধরা পড়ল সেটা অবশ্য আমারই মস্তিষ্কের জোরে।

এবারে ফেরার পালা। যতীনবাবু আমাদের বাড়ির ঠিকানায় বাবাকে টেলিগ্রাম করলেন। জানালেন কিউলে মস্ত এক ডাকাতের দলকে ধরিয়ে দিয়ে আমি পুলিসের বেজায় উপকার করেছি। আমাকে নিয়ে তাঁরা সদলবলে পরের গাড়িতে ফিরছেন।

অ্যাড্‌ভেঞ্চারে মাঝে মাঝে আমি পালাই এটাই বাবা জানতেন ;

ডাকাত ধরেছি এটা জেনে কী ভাবলেন কে জানে? একটা এক্সপ্রেস গাড়িতে আমরা চড়ে বসলুম। এবার আমার হাত খালি—কারণ আমার আটাশেটা তো পথেই খোওয়া গেছে।

বাড়িতে সবাই আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল, তাহলেও ববাই জেগে বসে ছিল আমাদের বৈঠকখানায় তার বাবার সঙ্গে।

আমরা ঢুকতেই সবার আগে উকিলবাবু বলে উঠলেন—আমরা সেই থেকে বসে আছি ডাকাত ধরার গল্প শোনবার জন্যে। শীগ্‌গির বলুন ডিটেকটিভবাবু।

বাবা বললেন—বা রে, হারানো-ছেলে কত দেশ ঘুরে ঘরে এলো, একটু জিরোক, মুখে জল দিক, না-হয় কালই হবে গল্প—

উকিলবাবু সবেগে মাথা নেড়ে বললেন—না, না, সমস্ত ঘটনা না শুনলে আমার ঘুমই হবে না। তোমার ছেলে তো ফিরেই এসে গেল বংশু, তবে আর ভাবনা কি—এখন কত জিরোবে জিরোক না। নিন্‌ ডিটেকটিভ বাবু আরম্ভ করুন—চা আসছে। তুমিও বলো বাবুই কী কী হয়েছিল।

সরলবাবু, যতীনবাবু আর আমি, তিনজনে মিলে তখন সবিস্তারে বলে গেলুম। সবাই মন দিয়ে শুনলেন। ববাইও। সব শেষে বাবা বললেন—সেবারের মতো এবারের অ্যাডভেঞ্চারেও পুলিসই তোমায় ধরল বাবুই?

আমি বললুম—পুলিস আমায় ধরল কী রকম? আমিই তো পুলিসকে চোর ধরিয়ে দিলুম।

বাবা বললেন—তুমি চোর ধরাতে পারো! কিন্তু পুলিস তো তোমায় ছাড়েনি—এখানে পৌঁছে দিয়ে গেল।

আমি বললুম—তা বটে।

ববাই যাবার আগে আমায় আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে—বাবুই-দা, আমি কিন্তু কাউকে কিছু বলি নি।

আমি তার পিঠ চাপড়ে বললুম—সাবাস সেক্রেটারি!

॥ ৫ ॥

কাল বিশ্বকর্মা পূজোর ছুটি গেছে। ববাই আর আমি দুপুর বাজতে না বাজতেই চন্‌চনে রোদ মাথায় করে ঘুড়ি লাটাই নিয়ে ছাদে উঠেছিলুম। ববাই ধরেছিল লাটাই আর আমি হাতে করে সুতো ধরে ঘুড়ি ওড়াচ্ছিলুম—কখনও লাট মেরে, কখনও টান মেরে, যখন যে-রকম দরকার। ববাই অবাক হয়ে আমার ঘুড়ি ওড়ানো দেখছিল। যতক্ষণ না সন্ধ্যার ছায়ায় চতুর্দিক অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল ততক্ষণ কোনমতেই নীচে নামিনি। মা জলখাবারের জন্যে ডাকতে পাঠিয়েছিলেন, আমি বলে দিলুম, আমাদের এখন সময় নেই। শেষে মা যখন রেকাবিতে করে আমাদের দু-জনের জন্যে জলখাবার সাজিয়ে ছাদে উঠে এলেন, তখন আমার বোসেদের বাড়ির তপনের সঙ্গে দারুণ প্যাঁচ চলেছে। তখন কি আমাদের খাবার সময় আছে?

মা বললেন—খেয়ে নে শীগ্‌গির।

আমার মুখ তখন আকাশের দিকে। বললুম—ঐখানে পাঁচিলের ধারে রেখে যাও মা, আমরা খাবো'খন।

মা বললেন—মনোহরা এনেছি—তোর যা ভালো লাগে—দেখ্!

তখন কি দেখবার সময় আছে? তপনের পেট-কাটা ঘুড়ি আমার লাল-সাদা ময়ূরপঙ্ক্ষীর ঘাড়ে এসে পড়েছে। আমি অল্প অল্প টিপ ধরে লাট ছেড়ে যাচ্ছি। এখন অন্যমনস্ক হলেই সর্বনাশ।

মা ওদিকে রেগে গিয়ে চেঁচাচ্ছেন—তুই না-হয় না খেলি। ববাই, তুমি বাছা এ-দিকে এস তো। হাত ধুয়ে একটু মিষ্টি খাও। ও দস্যি ছেলের কথা শুনো না।

—মা তুমি জ্বালালে দেখছি। রেখে যাও না খাবার। এই ববাই, খবরদার তুই লাটাই ছাড়িস্‌নে—দেখ্‌ছিস না কী রকম গোঁত্তা মেরে আসছে তপনের পেট-কাটা! সুতো দিয়ে যাবি আমায়।

মা বিরক্ত হয়ে খাবার রেখে চলে গেলেন।

তপনের ঘুড়ি কেটে এক হাতে সুতো ধরে অপর হাতে একটা সিঙাড়া ধরে কামড় দিয়েছি, সঙ্গে সঙ্গে একদিক থেকে একটা চাঁদিয়াল অন্যদিক

থেকে একটা চৌখুপি এসে পড়ল। সেদিন কখন যে কি রকম করে জলখাবার খাওয়া শেষ করেছি তা আর মনে নেই। মনোহরার স্বাদটাও বেবাক ভুলে গেছি।

আকাশের শোভাটা কাল যা খুলেছিল! যেন একটা স্বপ্নের রাজ্য। কত রকম রংয়ের ঘুড়ি। লালেতে-নীলেতে-সবুজেতে-সাদায় মিশে আকাশ ভরে যেন রংয়ের বান ডাকিয়ে দিয়েছিল। যেদিকে তাকাই—গাছের ডালে, ছাদের পাঁচিলে, টেলিগ্রাফের তারে, বাঁশের ডগায়, সব জায়গাতেই ঘুড়ি; শেষে চোখে পড়ল যেখান দিয়ে কারেণ্ট আসে, ট্রামের সেই রেফ্-এর মতো শিকটায় একটা চমৎকার দু-তে বেগ্নী রংয়ের ঘুড়ি জড়িয়ে পত্পত্ করতে করতে চলেছে। ঘুড়ির রং-এ রং-এ সমস্ত শহর যেন রঙিন।

আমার হাতও কাল আশ্চর্য রকম খুলে গিয়েছিল। সামনে-পিছনে, ডাইনে-বাঁয়ে যে-কেউ আমার ঘুড়ির সঙ্গে প্যাঁচ লাগাতে আসছিল, কেউ আমার কাছে পেরে উঠছিল না। ঘুড়ির পর ঘুড়ি কাটতে কাটতে আমার ময়ূরপঙ্ক্ষীটা দিগ্বিজয়ী বীরের মতো আকাশের এ-কোণ থেকে ও-কোণ পর্যন্ত যখন আনাগোনা করছিল, তখন বোধহয় ছাদে-ছাদে সাড়া পড়ে গিয়েছিল—কার ওই ময়ূরপঙ্খী? কেমন করে ওটাকে হারিয়ে দেওয়া যায়? এক সঙ্গে চার-পাঁচটা ঘুড়ি আমার সুতোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আক্রমণ করছিল, কিন্তু প্যাঁচ লাগাবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রত্যেকের সুতো যেন কোন যাদুবলে কেটে যাচ্ছিল। আমার সুতো কাটছিল এত কম যে তা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। ববাই ঘনঘন বাহবা দিয়ে উঠছিল, আমিও বিজয়-গর্বে আত্মহারা হয়ে উঠেছিলুম।

এমনি করে ঘুড়ির রঙিন জগতে কালকের দিনটা কেটেছে। নিজেকে পরম বীর বলে মনে হয়েছে। মনে হয়েছে, আমার তুল্য আর কেউ নেই। ক্ষুদ্র ববাইয়ের দিকে তাকিয়ে, তার বিস্ফারিত চোখের দিকে দৃষ্টিপাত করে মনে হয়েছে সারা দুনিয়াই বুঝি ওমনি মুগ্ধ-বিস্মিত নেত্র আমার দিকে মেলে দিয়েছে।

কিন্তু আজ? কালকের অমন নির্ভেজাল বিজয়, জয়োল্লাস যে এমন করে মিইয়ে যাবে কে জানতো? বেলা তিনটের সময় লাটাই-ঘুড়ি নিয়ে

ছাদে উঠেছিলুম। ববাই তখনও আসেনি। পয়লা আশ্বিন। পয়লা আশ্বিনের আজব-তত্ত্বটার উপর একটু চোখ বোলাতে বসলুম। প্রথম পৃষ্ঠাতেই একটা লেখা বেরিয়েছে—"হায়রে মোদের শিশুর দল!" পড়তে শুরু করে দিলুম। পড়তে পড়তে মাথা হেঁট হয়ে গেল, রক্ত গরম হয়ে উঠল, শরীরের লোম খাড়া হয়ে উঠল। গত কালকের বিশ্বকর্মা পূজোর ঘুড়ি-উৎসবকে উপলক্ষ্য করেই লেখা। লেখক জ্বালাময়ী ভাষায় লিখে যাচ্ছেন—এই দেশের ছেলেরা অন্য দেশের ছেলেদের তুলনায় কত প্রাণহীন, কত ভীরু, কত বোকা, কত নিরুৎসাহ, নিস্পন্দ, ঘরকুনো, ছাদকুনো। আমাদের ছেলেরা ইস্কুলের লেখাপড়ার পর যখন ছুটি পায় তখন ঘুড়ি উড়িয়েই সময় কাটিয়ে দেয়, না-হলে লাট্টু বা মারবেল, বড় জোর ফুটবল, হা-ডু-ডু-ডু; অনেকে তো আবার বই খুলেই বসে। এদিকে অন্য দেশের ছেলেরা লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে বন্দুক-কাঁধে শিকার করে বেড়ায়, সমুদ্রের মাঝে ঝাঁপ খেয়ে বেড়ায়, মারামারি, লাঠালাঠি করে; কেউ চড়ে এরোপ্লেনে, কেউ বিদেশগামী জাহাজে, কেউ করে সার্কাস, কেউ হয়তো বাড়ি-ঘর ছেড়ে একাই পালিয়ে যায় দেশ ঘুরতে।—পড়তে পড়তে আমার সমস্ত শরীর আগুনের মতো গরম হয়ে উঠল।

সেই সময় ববাই ছাদে আসতেই আমি বলে উঠলুম—নাঃ, একটা কীর্তি করে এদের না-দেখালে আর চলে না দেখছি।

ববাই বললে—কি কীর্তি বাবুই-দা?

আমি বললুম—অ্যাড্‌ভেঞ্চারে আমায় আবার বেরতে হবে ববাই, যে যতই বাধা দিক। আমি বেশ বুঝছি, আমাদের ছেলেদের এই দুর্নাম ঘোচাবার কর্ণধার যদি কেউ হয় তো সে আমি!

ববাই বললে—কিসের দুর্নাম?

—দুর্নাম নয়? এই দেখ না আজব-তত্ত্বে কি লিখেছে।

বলে কাগজটা তার দিকে এগিয়ে দিলুম।

ববাই বললে—তুমি পড়ো বাবুই দা।

খানিকটা খানিকটা তাকে পড়ে শোনাতে ববাই বলে উঠল—কেন বাবুই-দা, তুমি বাংলাদেশের এত বড় হীরো থাকতে কি করে এ-দেশের এত নিন্দে হয়? তুমি ওদের কাগজে তোমার নাম পাঠিয়ে দাও।

বুঝুক ওরা। এতবড় অ্যাড্‌ভেঞ্চার করে এলে তুমি, তারপর কাল এক-হাতে কত কত ঘুড়ি কেটে দিলে, কেন, ঘুড়ি ওড়ানো কি চাট্টিখানি কথা হল ? আসুন না আজব-তন্ত্রের লেখকমশায় তোমার সঙ্গে প্যাঁচ খেলতে !

আমি তাকে থামিয়ে দিয়ে বললুম—না রে, ববাই তুই বুঝছিস্ না। আমায় একটু ভাবতে দে। আমায় আরও বড় অ্যাড্‌ভেঞ্চার করতে হবে। বলে আমি পাঁচিলের এক কোণে বসে পড়লুম। ববাইও আমার পাশে লাটাইটা কোলে করে বসল।

বিশ্বকর্মা পূজোর পরের দিন তো। নির্মেঘ আকাশ। আজও আকাশ ঘুড়িতে-ঘুড়িতে ছেয়ে গিয়েছিল। আজব-তন্ত্রের লেখাটার কথাই ভাবছিলুম। কিন্তু সেখান থেকে আমার মনটা মাঝে মাঝে আকাশ-রাজ্যে ঘুড়ির সুতো বেয়ে প্যাঁচের রাজ্যে পৌঁছে হঠাৎ খেই হারিয়ে ফেলছিল। মাকড়সার জালে যেমন মাছি আটকা পড়ে, ঐ আকাশ-বেড়া ঘুড়ির সুতোর জালের মধ্যে আমারও মনটা মাঝে-মাঝে নিঃসহায়ভাবে আটকা পড়ে যাচ্ছিল। প্রাণপণে তাকে আবার টেনে বার করে আনছিলুম। মাথার উপর চতুর্দিক থেকে ফর্‌র্ ফর্‌র্ শব্দে নানান ঘুড়ি ডেকে বেড়াচ্ছিল—যেন তারা সবাই আমাকে আজ প্যাঁচ খেলবার্ জন্যে ডাক দিতে এসেছে। থেকে থেকে মনে হচ্ছিল—কালকের মতো আজও একবার আমার ক্ষমতাটা দেখিয়ে দিই। কিন্তু আজব-তন্ত্রের সেই লেখাটার কথা মনে পড়তেই দৃঢ় স্বরে বলে উঠছিলুম—নাঃ, আর নয়। ঘুড়ি উড়িয়ে আর নিজেকে খাটো করব না।

আকাশের দিকে চেয়েই ভাবছিলুম। সেখানে ঘুড়ির ঝাঁক ক্রমেই বেড়ে চলল। প্যাঁচের পর প্যাঁচ খেলা হতে লাগল। এদিকে ওদিকে ঘুড়ি কেটে পড়তে লাগল ঝরাপাতার মতো। এমন সময় সেই মতলবটা এলো আমার মাথায়। আজব-তন্ত্র মুড়ে আমি উঠে দাঁড়ালুম।

ববাইকে বললুম—ববাই, আমি চললুম। আমায় এখনই অ্যাড্‌ভেঞ্চারে বেরোতে হবে। যা করতে যাচ্ছি তোমায় এখন তা বলা যাবে না। বললে তুমি হয়তো আঁৎকে উঠবে! যাই হোক ব্যাপারটা তুমি গোপন রেখো। মনে রেখো, তুমি আমার সেক্রেটারি।

ববাইয়ের দেখতে দেখতে মুখ-টুখ লাল হয়ে উঠল। সে বলল—সত্যি তুমি অ্যাড্‌ভেঞ্চারে যাচ্ছো বাবুই-দা ?

—হ্যাঁরে, সত্যিই তো।

—বলো না, কী ভাবলে এতক্ষণ। আমি একটুও আঁৎকে উঠব না।

—এখন আর সময় নেই। আমি চললুম, তুই ছাদ থেকে যখন দেখতে পাবি আমি গলি পেরিয়ে চলে গেছি, তখন আমার লাটাই ঘুড়িগুলো চুপিচুপি আমার ঘরে রেখে দিয়ে বাড়ি চলে যাস্‌। ব্যাস্‌, আর তোকে কিছু করতে হবে না।

বলে আমি নীচে নেমে গেলুম। মা রান্নাঘরে ছিলেন। বাবার শুনেছিলুম বাইরে কোথায় নেমন্তন্ন ছিল—সেখানেই হয়তো গেছেন, তাঁর কোনো সাড়া পেলুম না। জুতোজোড়াটা পায়ে লাগিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। মনে-মনে ভাবতে ভাবতে চললুম, শহরসুদ্ধ লোককে আমার কীর্তি দেখিয়ে আজ অবাক করব। আমাদের ছাদের দিকে চট করে দেখে নিলুম একবার। পাঁচিলের উপর দিয়ে চোখে পড়ল, মুখে একটা আঙুল ঠেকিয়ে ববাই দাঁড়িয়ে আছে।

রাস্তার মোড়ে একটা দোকান। সেখান থেকে শক্ত দেখে খানিকটা দড়ি কিনলুম। তারপর উঠে বসলুম দমদম ক্যাণ্টনমেণ্টের একটা বাস-এ।

বাস-এ বিশেষ ভিড় ছিল না। যাঁরা যাচ্ছিলেন, তাঁদের মধ্যে কেউই জানে না যে আমি বাবুই, বাংলাদেশেরই ছেলে, অসীম সাহসে ভর করে এক অ্যাড্‌ভেঞ্চারে চলেছি। ইংরেজ-শাসিত রাজ্যে তাঁদের ধারণা, পরাধীন বাঙালীরা বুঝি কিছুই পারে না ; যা-কিছু পারে শুধু ইংরেজরাই আর তাদের ছেলেরা। বাঙালী ছেলেরা ঘরকুনো, মিনিমুখো মিনমিনে। আচ্ছা, আচ্ছা, এ ধারণা ভাঙবে, আজই ভাঙবে। পৌঁছতে দাও আমাকে একবার দম্‌দমায়। সামনের সীটে আমারই বয়সী একটি ছেলে তার বাবার সঙ্গে চলেছে। ছেলেটির অপরাধ, সে জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়েছিল রাস্তার ধারের একগুচ্ছ পাতা ছেঁড়বার

জন্যে। সে কী বকুনি তার বাবার। আমার ভারি একটা কৃপা হতে লাগল সেই বাবাটির উপর—উনি জানেনই না, ওঁর ওই ছেলের মধ্যে কী সম্ভাবনা লুক্কায়িত আছে। হলোই না হয় বাঙালা, এ-যুগের ছেলে তো। বাবাদের আমলে আজব-তত্ত্ব ছিল না। আমাদের যুগে আছে আজব-তত্ত্ব। আজব-তত্ত্ব যোগাচ্ছে আমাদের উদ্দীপনা, কল্পনা, অনুপ্রেরণা। আমাদের রুখবে কে? মনে হল এই বাসটা যেমন জোরে ছুটেছে, আর একটু জোরে ছুটলেই একে ভেবে নেওয়া যেতে পারত একখানা এরোপ্লেন। দেড়শ মাইল বেগে আকাশ দিয়ে উড়ে চলেছে। তাহলে কি আর আমি এতক্ষণ বাসের মধ্যে বসে থাকতুম? এই দড়ি নিজের কোমরে শক্ত করে বেঁধে বাসের পিছন দিয়ে ঝুলিয়ে দিতুম নিজেকে শূন্যে। ঝড়ের বেগে উড়ে চলতুম শহরের মাথা দিয়ে—উঁচু উঁচু বাড়ি, মন্দির, গির্জে, মিনার, গাছপালার উপর দিয়ে। নীচের মানুষ অবাক হয়ে হাঁ করে দেখত আমার দিকে আর ভাবত এ আবার কে, বাঙালী না কি? তখন ঐ ভীরু-ভীরু বাবাগুলি কী বলতেন, ঐ যে একজন যিনি ছেলের হাত টেনে বাস-এর মধ্যে ঢুকিয়ে নিলেন?

সত্যি কথা বলতে কি, এ-ই তো আমার মতলব। আজ দমদমায় চলেছি এই মতলবই হাসিল করবার জন্যে।

দমদমায় এসে পৌঁছল আমাদের বাস। চললুম হাঁটতে হাঁটতে যেখান থেকে উড়োজাহাজ ওড়ে সেই মাঠের দিকে। মাঠে পৌঁছে দেখি, দুটো তিনটে উড়োজাহাজ মাঠের উপরেই ঘুরে ঘুরে উড়ে বেড়াচ্ছে। ওড়া শিখছে বোধহয়। এখানে এরোপ্লেন চালানোর ইস্কুল আছে। দূর আকাশ দিয়ে ফুটকির মতো একটা উড়োজাহাজ আসছে মাঠের দিকে—হয় তো নামবে বলে। আর একটা মাঠে দাঁড়িয়ে তৈরী হচ্ছে ওড়বার জন্যে।

হাতে আমার দড়ি—মুঠোর মধ্যে শক্ত করে ধরা। যখনই গোঁ গোঁ করে উঠবে ওর পাখা, তখনই ছুট দেব ওর দিকে। দড়ি ছোঁড়া অভ্যেস আছে, ওর ল্যাজে দড়ির ফাঁস লাগাতে অসুবিধে হবে না। কোমরে আমার বাঁধা থাকবে দড়ি। কাজেই কেউ যদি বাধা না দেয় তাহলে এরোপ্লেনের পিছনে ঝুলতে ঝুলতে আমিও উঠব শূন্যে। তারপর

যে কী হবে তা ঠিক জানি না। তবে মনে হয়, ঝুলেই থাকব কারণ দড়ি সহজে ছেঁড়বার নয়। ঐ রকম ভাবে ঝুলতে ঝুলতে আকাশের মধ্যে দিয়ে দেড়শ মাইল বেগে ছুটে চলতে কেমন লাগবে তা-ও জানি না। কিন্তু উড়োজাহাজ আমায় নিয়ে যখন সারা কলকাতা শহরের উপর দিয়ে ঘুরতে থাকবে আর হাজার হাজার লোক আমাকে ঐ অবস্থায় দেখে শিউরে উঠবে, তারপর, উড়োজাহাজ শহর ঘুরে এসে এখানকার মাটিতে নামবে আর আমার চারিদিকে দলে দলে লোক ঘিরে আসবে—তারপর সবাই জানবে, আমি বাবুই ইচ্ছে করেই এই অ্যাড্ভেঞ্চার করেছি, খবরের কাগজের পাতায় পাতায়, আজব-তত্ত্বে তো বটেই, আমার এই আশ্চর্য সাহসের কথা সগৌরবে ছাপা হবে—তখন আমার অবস্থাটা যে কি-রকম হবে, এ যেন আমি চোখের সামনে বায়োস্কোপের মতো দেখতে পাচ্ছিলুম।

চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছি দড়ি হাতে। দেখতে হবে কারোর যাতে কোনো রকম সন্দেহ না হয়। সন্দেহ হলেই মুশকিল! লোকের চোখে ধুলো দিয়ে কাজটা হাসিল করতে হবে। ফুটকির মতো যে উড়োজাহাজটা দূরের আকাশে উড়ছিল, আস্তে আস্তে সেটা এসে মাটিতে নামল। নেমে চলে গেল হ্যাঙ্গারের মধ্যে জিরোতে। তারপর দেখলুম একজন লোক মাথায় মুখোশ পরে চোখে এক-জোড়া প্রকাণ্ড চশমা এঁটে উড়োজাহাজের কাছে চলেছেন। বুঝলুম ইনিই জাহাজ চালাবেন। এইবার আমার প্রস্তুত হবার সময়। স্বপ্ন এইবার সফল হবে। উদগ্র হয়ে অপেক্ষা করছি, কখন গোঁ গোঁ শব্দ ওঠে পাখার। ফাঁসটা হাতের মুঠোয় বাগিয়ে ধরা। নিঃশ্বাস একদম বন্ধ।

এমন সময় আমার পিছন থেকে—এই যে রে, এই যে, পাওয়া গেছে। এদিকে আয়!—বলে কারা চীৎকার করে উঠল। পিছন ফিরে তাকাতে না তাকাতে দু-তিনজন লোক হুড়মুড় করে এসে আমায় ধরে ফেললে।

মনে-মনে ভাবলুম—সর্বনাশ, তবে তো এরা আমার মতলব টের পেয়ে গেছে দেখছি। হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু যে-রকম চেপে ধরেছে, ছাড়াতে পারলুম না। এদিকে উড়োজাহাজটা ভোঁ ভোঁ করে গর্জন করে উঠল।

তাদের মধ্যে একজন লোক বলে উঠল—ভাবছ, ফাঁকি দিয়ে পালাবে? সেটি হচ্ছে না।

আমি আমতা আমতা করে বললুম—আজ্ঞে আমি তো পালাতে চেষ্টা করিনি।

তিনি ধমকে উঠে বললেন—পালাও নি তো কি? তবে কি এখানে হাওয়া খেতে এসেছ? ও সব হচ্ছে না, তোমাকে আমরা সহজে ছাড়ছিনে।

আমি বললুম—না মশায়, আমি পালাতে আসিনি—আবার এইখানেই তো এসে পড়তে হত আমাকে। যেতুম আর কোথায়?

লোকটা বলে উঠল—তা তো হতই। পালিয়ে কি আর নিষ্কৃতি পেতে? ধরা পড়তেই হত। আর হেডমাস্টার মশায়ও অত সোজা লোক নন। তোমার জন্যে হলদে-কুঠিতে বসে আছেন—চল না একবার। হবে।

বুঝলুম, হেডমাস্টার মশায় সুদ্ধ আমার কীর্তি শুনেছেন। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কি করে খবরটা রটে গেল ভেবে অবাক হলুম। হেডমাস্টার মশায় যে সোজা লোক নন তা আমি বিলক্ষণই জানতুম—কিন্তু তাই বলে তাঁর ভয়ে জড়সড় হয়ে থাকব, এ-ই বা হয় কি করে? বুক ফুলিয়ে বললুম—চলুন না হেডমাস্টার মশায়ের কাছে—ভয়টা কিসের?

এরোপ্লেনটা দু-বার লাফিয়ে সামনের দিকে ছুটে গেল, তারপর হুস্ করে উঠে পড়ল আকাশে। আমি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে এঁদের সঙ্গে চললুম।

মিনিট পনেরো হেঁটে আমরা যেখানে এসে উপস্থিত হলুম তার সামনেই রয়েছে একটা বাড়ি, তার হলদে রংয়ের গেট, হলদে রংয়ের দেয়াল। বুঝলুম, এইটিকেই হলদে-কুঠি আখ্যা দেওয়া হচ্ছিল। আশ্চর্য লাগল ভেবে, কেমন করে আমার সন্ধান-সুলুক পেয়ে আমাদের ইস্কুলের হেডমাস্টার মশায় দমদমার এই হলদে-কুঠিতে এসে আমার খোঁজে বসে আছেন।

আমাদের দেখতে পেয়ে দোতলার বারান্দা থেকে একজন বাবরি চুলওয়ালা ভদ্রলোক প্রায় ছুটতে ছুটতে নেমে এলেন। কিন্তু আমায়

দেখেই—আরে দূর, এ কাকে নিয়ে এলি, এ তো বোঁচকা নয়!—বলেই ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন। তাঁর বসার ভঙ্গী দেখেই বুঝলুম, ইনি কারো জন্যে বা কিছুর জন্যে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে অপেক্ষা করছিলেন, এখন সেটা না ঘটায় অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়েছেন।

আমি বাবরিচুলো হেডমাস্টারের দিকে খানিকটা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলুম—কিছুই বুঝতে পারলুম না। ইনিই তাহলে হেডমাস্টার মশায়, যিনি বোঁচকা নামক আমারই মতো কোনো ছেলেকে ধরতে পাঠিয়েছেন? বোঁচকাটি কে? আমারই মতো অ্যাডভেঞ্চারের ভক্ত কেউ না কি? বোঁচকা পালিয়েছেই বা কেন? এ সব প্রশ্নের জবাব হেডমাস্টার মশায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে কিছুই পেলুম না। শুধু বুঝলুম, ভুল করে এরা আমায় ধরে এনে আমার অমন প্রায়-পেকে আসা অ্যাডভেঞ্চারটিকে কাঁচিয়ে দিয়েছে। যে লোকটি আমায় ধরে এনেছিলেন তিনি বত্রিশপাটি দাঁত বার করে বললেন—বড় ভুল হয়ে গেছে, আপনাকে ঠিকমতো চিনতে পারিনি।

তাঁর বোকার মতো হাসি দেখে আমার ভারি রাগ হল—বললুম—চিনতে পারেননি বলে অচেনা লোককে ধরবেন? আপনি বোঁচকাকে চোখে দেখেছেন কখনও?

তিনি বললেন—না কখনও দেখিনি।

আমি বললুম—তবু তাকে ধরতে বেরিয়েছিলেন? আবার এখন না-পেরে হাসছেন? এটা কি হাসবার জিনিস হল?

তিনি তখন মুখ কাঁচুমাচু করে বললেন—আজ্ঞে উনি আমাদের পাঠিয়েছিলেন। বলে হেডমাস্টারমশায়কে দেখালেন।

বাবরিচুলো হেডমাস্টার আমতা আমতা করে বললেন—মাপ করবেন। এরা আপনাকে চিনতো না। শুধু আপনার হাতে দড়ি দেখে ভুল করে নিয়ে এসেছে।

আমি বললুম—দড়ি দেখে? কেন দড়িতে কী দোষ করল?

—না না দোষ আর কি? বোঁচকাও দড়ি নিয়ে পালিয়েছিল কি না তাই।

আশ্চর্য তো! বোঁচকাও তাহলে দড়ি নিয়ে পালিয়েছিল আমারই

মতো ? কী উদ্দেশ্যে ? সে-ও কি আমারই মতো দড়ির ফাঁস বেঁধে এরোপ্লেনের ল্যাজের সঙ্গে ঝুলে শহর-মাঠ-নদীর উপর দিয়ে উড়ত না কি ?

সেই লোকটি হেডমাস্টারকে বলে উঠল—আপনিই তো বলে দিলেন মশায়, দড়ি-হাতে ছেলে—দুষ্টু চেহারা—বেশী দূরে যায়নি। এখন মিলিয়ে দেখে নিন্ না, মিলছে কি না !

হেডমাস্টার মশায় অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। কী উত্তর দেবেন ভাবছেন, আমি বললুম—কী হয়েছে বলুন তো ব্যাপারটা ?

তিনি বললেন—ব্যাপারটা হচ্ছে, আজ ক-দিন ধরে এখানকার নানা ইস্কুলে মিলে স্পোর্টস হচ্ছে। নানারকমের স্পোর্টস। সব জায়গায় যা হয়, যেমন, দৌড়োনো, লাফানো, সাঁতার, তীর ছোঁড়া, ঘোড়দৌড়, বন্দুক ছোঁড়া, বর্শা ছোঁড়া এ সব তো আছেই, তা ছাড়া আছে, এ তল্লাটের সেরা স্পোর্টস, লঙ্গর ছোঁড়া—

আমি অবাক হয়ে বললুম—লঙ্গর ছোঁড়া ? সে আবার কী ?

—ওটা একটা নতুন খেলা। এদিকে খুব চলে। দড়ির মাথায় ফাঁস করে ছুঁড়ে মারতে হয়। তা ব্যাপার হয়েছে কি, আমাদের এই দড়ি-ছুঁড়িয়েকে আজ পাওয়া যাচ্ছে না।

—আর সেই জন্যে তাকে খুঁজতে গিয়ে আমাকে ধরে এনেছেন। তা তো বুঝলুম। কিন্তু তার মতো দড়ি-ছুঁড়িয়ে কি আপনাদের আর কেউ নেই ?

—আমাদের কেন ? এ তল্লাটেই নেই।

—তবে পালাল কেন ?

—সেটাই তো বুঝতে পারছি না। ওরে তোরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁ করে কী শুনছিস ? বোঁচকাকে খুঁজতে হবে না ? যা এখনই যেখান থেকে পারিস খুঁজে আন্।

লোকগুলো পিঠ্‌টান দিতে আমি বললুম—যদি কিছু মনে না করেন, এই লঙ্গর ছোঁড়া জিনিসটা কী আমাকে একটু ভালো করে বুঝিয়ে বলবেন ? আমি কলকাতায় থাকি কি না—এদিককার ব্যাপারগুলো জানি না।

হেডমাস্টার মশায় বললেন—এ অঞ্চলে প্রচুর পুকুর-ডোবা আছে তো সেই কারণে এখানে খেলাটা খুব হয়। জলের মাঝখানে তক্তা হোক, বয়া হোক, একটা কিছু দড়ি দিয়ে বেঁধে ভাসিয়ে রাখা থাকে। সেই বয়ার মাথায় গোঁজা থাকে একটা নিশেন বা ঐরকম কিছু। পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে লঙ্গর ফেলে নিশেনটাকে জিতে নিতে হয়।

আমি বললুম—শুনে মনে হচ্ছে খেলাটা এমন কিছু শক্ত নয়। বোধহয় আমিও পারব। যাই হোক, আজকের খেলায় না জিতলেই কি আপনাদের নয় ?

হেডমাস্টার মশায় বললেন—এ তল্লাটের সব ইস্কুল মিলে যে কম্পিটিশান চলেছে এ কয়দিন, তাতে আমাদের ইস্কুল পয়েণ্টে ফার্স্ট যাচ্ছে। আজ শেষ দিন। আজ বাকি শুধু তীর ছোঁড়া আর লঙ্গর ছোঁড়া। আজকে জিততে পারলেই আমরা চ্যাম্পিয়ান হয়ে যাব। আমাদের তীরন্দাজ কেউ ভালো নেই ওটাতে আমরা হেরে যাবো জানি। কিন্তু আমাদের আজকের জিত নির্ভর করছে ঐ বোঁচকা ছোঁড়াটার উপর। এদিকে বিপদ দেখুন; এখনও সে এসে হাজির হয়নি। তার বাড়িতে লোক পাঠিয়েছিলুম; তাঁরা বললেন, আজ ভোরবেলা বাড়িতে ঝগড়া-ঝাঁটি করে গলায় দড়ি দেবে বলে ভয় দেখিয়ে একটা দড়ি নিয়ে কোথায় সে পালিয়ে গেছে। এই এত কাণ্ড, অথচ বাড়ি থেকে আগে কিছুই আমাদের জানানো হয়নি। গলায় তো আর সে সত্যিই দড়ি দিচ্ছে না, নিশ্চয় কোথায় লুকিয়ে আছে কিন্তু এত বেলায় এখন কোথায় তার খোঁজ করি! চারিদিকেই লোক পাঠিয়েছি। খুঁজছে তাকে। সবাই তাকে চেনে না তাই আপনার হাতে দড়ি দেখে কেমন করে ভুল হয়ে গেছে।

আমি বললুম—সত্যি ও গলায় দড়ি দিতেও পারে, যে-রকম ছেলে শুনছি। মোটামুটি ওর আশা ছেড়ে দিন। ধরুন যদি আজ সে না-ই আসে, তাহলে কী হবে ?

হেডমাস্টার মশায় বললেন—তা হলে হবে আমার মাথা আর মুণ্ডু! নন্দীদের ইস্কুল এ-বছর চ্যাম্পিয়ান হয়ে যাবে।

আমি বললুম—এক কাজ করুন। বোঁচকার কথা আর ভাববেন

না। আমাকে আজই এখনই আপনাদের ইস্কুলে ভর্তি করে নিন। আমি এই লঙ্গর ছোঁড়ার কম্পিটিশানটায় নাম দেব, দয়া করে আমার নামটা পাঠিয়ে দিন।

হেডমাস্টার মশায় অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকালেন। খানিক থেমে বললেন—আপনার কি লঙ্গর ছোঁড়ায় ভাল হাত আছে না কি?

আমি প্রশ্নটাকে চাপা দিয়ে বললুম—আমাকে আর 'আপনি' বলে ডাকবেন না।

হেডমাস্টার মশায় মাথা নেড়ে বললেন—তা বেশ, কিন্তু ইস্কুলে ভর্তি হতে গেলে তোমার অভিভাবকের মত চাই যে।

আমি বললুম—অভিভাবকের মত আমি কাল সকালেই আপনাকে এনে দেব। আমাকে ইস্কুলে নিয়ে নিন্।

—তা বেশ, তোমার যখন এত ইচ্ছে।

—শুধু বেশ নয়, দড়ি-ছোঁড়ার কম্পিটিশানে আমায় যোগ দিতে দিন।

—তা দিতে পারো, অনেকেই তো দিচ্ছে। কিন্তু এই বলে রাখলুম, আমাদের আশাভরসা ঐ বোঁচকা। ওর জোড়া এ-তল্লাটে নেই। এদিকে সময় তো হয়ে এল; আচ্ছা মুস্কিলে ফেললে ছোঁড়াটা। যাই, গিয়ে দেখে আসি, খেলার জায়গাতেই এসে পড়েছে কি না। বলে সেখান থেকে উঠে গেলেন।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ইস্কুলে ভর্তি হয়ে পড়া গেল। তারপর ছুটলুম খেলার জায়গায়। হেডমাস্টার মশায় যাবার আগে ড্রিল-মাস্টারের কাছে আমায় দিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি আমায় নিয়ে গেলেন ছেলেদের দলের মাঝখানে। রণেন, দামু, সুবীর তিনজন ছেলের সঙ্গে তখনই আলাপ হয়ে গেল। এরা সবাই লঙ্গর-ছোঁড়ার প্রতিযোগিতায় যোগ দিচ্ছে। প্রত্যেকের হাতে একটা করে বিশ হাত লম্বা নরম পাটের দড়ি। আমার দড়িটা বদলে ঐ রকম একটা প্রতিযোগিতার দড়ি দেওয়া হল।

সুবীর বললে—তুমি এর আগে কোনো দড়ি-ছোঁড়ার কম্পিটিশানে নেমেছিলে নাকি?

—দেখিই নি কখনও, তা নামবো কোত্থেকে ?

রণেন বলল—তবু হেডমাস্টার মশায় তোমার নাম দিয়ে দিলেন ?

—না দিয়ে করেন কি ? আমাকে ভুল করে ধরে এনে যে মহা অপ্রস্তুতে পড়েছিলেন।

—তাই তো শুনলুম। তোমায় নাকি উড়োজাহাজের মাঠ থেকে বোঁচকা ভেবে ধরে আনা হয়েছে ?

—হ্যাঁ, হাতে দড়ি ছিল তাই।

—দড়ি নিয়ে কি করছিলে তুমি ?

—ফাঁস ছুঁড়ে মারবার চেষ্টা করছিলুম, এরোপ্লেনের ল্যাজে।

—কেন, এরোপ্লেন ধরবে নাকি ?

—উড়োজাহাজের সঙ্গে নিজেকে বেঁধে আকাশে উড়তুম।

—পারতে ?

—ঠিক পারতুম। এরা নেহাৎ ধরে আনল তাই হল না।

—উড়োজাহাজের ল্যাজে ফাঁস ছুঁড়ে মারা তো সহজ নয়।

—ঘুড়ির লঙ্গর অনেক ছুঁড়েছি কখনও ফস্‌কায় না। এটাও তো তারই মতো। লক্ষ্যে ভুল হত না।

দামু বলল— তা না হয় মানলুম। কিন্তু উড়োজাহাজ থেকে ঝুলতে ঝুলতে ওড়া কি মানুষের পক্ষে সম্ভব ?

সুবীর বললে—ঠিক বলেছিস্। ছিঁড়ে পড়ে যেতে পারে কিংবা ঘেঁষ্‌ড়ে যেতে পারে। আরও কত কি হতে পারে।

আমি বললুম—ঠিক কি হতো তা আমি জানি না। তবে যদি সফল হতুম, তা হলে একটা ভীষণ কাণ্ড হত তাতে কোন সন্দেহ নেই।

রণেন বলল—তোমার মাথায় এ-বুদ্ধি এলো কী করে ?

কি জবাব দেব ভাবছি, এমন সময় হুইসিল্ পড়ল। লঙ্গর ছোঁড়ার প্রতিযোগিতার ডাক পড়েছে।

পুকুরের ধারে গিয়ে দেখলুম, পুকুরের ঠিক মাঝখানে একটা বড় বয়া ভাসানো। বয়ার গায়ে বড় বড় লোহার কাঁটা আর বয়ার মাথায় একটা রূপোর নিশেন। বয়ার কাঁটায় ফাঁস লাগিয়ে বয়াকে টেনে এনে নিশেনটাকে দখল করতে হবে।

রণেনদের জিজ্ঞেস করলুম—দু-তিনদলের ফাঁস এক সঙ্গে বয়ার কাঁটায় লাগলে তখন কী হয় ?

ওরা বলল—তখন একটা 'টাগ্-অফ-ওয়ার' হয়। তাতে যে বা যারা জিততে পারে। মোটের উপর নিশেনটা পাওয়া চাই নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে।

ড্রিলমাস্টার এসে বললেন—শীগ্গির যাও তোমরা ইউনিফর্ম পরে এসো। টেণ্ট্ থেকে ইউনিফর্ম পরে বেরিয়ে আসতে চোখে পড়ল, পাশেই হেডমাস্টার মশায়ের আপিসঘর। ভাবলুম, একবার দেখা করে যাই। ঢুকতে যাচ্ছি, একজন হাত নেড়ে বারণ করলে। একটুখানি উঁকি মেরে দেখি, সে কী কাণ্ড! দুই চক্ষু রক্তবর্ণ, সজোরে মুঠো পাকানো, বিস্রস্ত বাবরি চুল, ঘর্মাক্ত কলেবর হেডমাস্টার মশায় ঘরের মধ্যে কেবল এদিক আর ওদিক পায়চারি করছেন। শুনলুম নন্দীদের ইস্কুল নাকি ঘুষ দিয়ে আমাদের দড়ির চ্যাম্পিয়ান বোঁচকাকে নিজেদের ইস্কুলে নিয়ে গেছে। বাড়িতে ঝগড়া-ঝাঁটি, গলায় দড়ি এ সব খবরই মিথ্যে। খবর শুনে অবধি হেডমাস্টার মশায় রাগে অগ্নিশর্মা। কার উপর যে রাগ ফলাবেন, বোঁচকার উপর, না বোঁচকার বাবার উপর, না নন্দী ইন্স্টিটিউশানের উপর, এখনও ঠিক করতে পারছেন না বলেই ঘরের মধ্যে সবেগে পায়চারি করছেন। এখন সবাই ভয় পাচ্ছে যে শেষ অবধি হেডমাস্টার মশায় একটা মাথা-ফাটাফাটি কাণ্ড না বাধিয়ে বসেন।

আমার আর তখন হেডমাস্টার মশায় কি করেন দেখবার সময় ছিল না। খেলোয়াড়রা ইউনিফর্ম পরে ছুটছে পুকুরের দিকে। আমিও ছুটলুম। খেলোয়াড়দের সকলের নাম ডাকা হল। খুঁটি পোঁতা ছিল পুকুরের চারিধারে। তাইতে একটা করে পা বেঁধে দেওয়া হল আমাদের, যাতে নিজের জায়গা থেকে নড়তে না পারি। পুকুরের উত্তর পাড়ে দাঁড়িয়েছিল নন্দী ইন্স্টিটিউশানের ছেলেরা, তাদের মধ্যমণি বোঁচকা; পূর্ব-পাড়ে আমাদের দমদম অ্যাকাডেমি; দক্ষিণ দিকে দমদম ছুতোরপাড়া ইস্কুল; আর পশ্চিম দিকে আর একটা কি ইস্কুল।

সবাই দাঁড়াতেই রেফারি গুড়ুম করে একটা পিস্তল ছুঁড়ে দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক থেকে সাপের মতো কিলবিল করে একরাশ দড়ি জলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু কোনো দড়িই আটকাল না। বয়ার গা বেয়ে পিছলে জলে গিয়ে পড়ল। ছেলেরা ভিজে দড়ি টেনে গোল করে হাতের চারিদিকে পাকিয়ে নিয়েই যে যত জোরে পারে আবার ছুঁড়ে মারল। আমাদের দিক থেকে চারটে দড়িই ছোঁড়া হল। এবারেও লাগল না। সেই সময় চোখে পড়ল উত্তরদিকের কার একটা দড়ির ফাঁস কাঁটার গায়ে লেগেছে। সভয়ে দেখলুম সে দড়ি বোঁচকার। উত্তরদিক থেকে একটা ভীষণ হর্ষধ্বনি উঠল। দেখলুম বোঁচকা দড়ি ধরে টানছে আর বয়াটা ধীরে ধীরে তার দিকে এগিয়ে আসছে। হেডমাস্টার মশায় তখন আমাদের পিছনে দাঁড়িয়ে তাঁর বাবরি-চুল ছিঁড়ছিলেন কিনা জানি না। ও সব দেখবার ভাববার তখন সময় নেই। আবার চেষ্টা করতে হবে। শেষ চেষ্টা! দড়ি গুটিয়ে নিয়ে আবার আমাদের ফাঁস ছুঁড়ে মারতে হবে। ক্রমেই এগিয়ে চলেছে ভারি বয়াটা বোঁচকার দিকে রৌপ্যমণ্ডিত বিজয়-নিশান নিয়ে। সেই সময় ছুঁড়লুম আমার নাগপাশ। এবারে আব বয়ার কাঁটার দিকে তাক করিনি। আমার লক্ষ্যবস্তু ছিল মাস্তুলের উপরকার নিশেনটা। এবারে আমার লক্ষ্য অব্যর্থ হল। আমার দড়িব পাশ গিয়ে নিশেনের ডাঁটা জড়িযে ধরল।

মারলুম এক হ্যাঁচকা টান। মাস্তুল থেকে উপড়ে গিয়ে নিশেনটা পড়ল জলের মধ্যে আমার দড়ির মাথাসহ। নিশেন গেল ডুবে। অতি সন্তর্পণে আমি দড়ি ধরে টানতে লাগলুম। এখন নিশেন হারালে চলবে না। বোঁচকার হাত থেকে জয়-পতাকা ছিনিয়ে নিয়েছি কিন্তু জয়লক্ষ্মী এখনও আমার হাতে আসেননি। পুকুরের চারিপাশে সবাই স্তব্ধ। টানতে টানতে ক্রমে দড়ি শেষ হয়ে গেল আর পুকুরের ময়লা জলের মধ্যে থেকে রূপোলি মাছের মতো চক্‌চক্‌ করতে করতে রূপোর নিশেনটা উঠে এল সরাসরি আমারই হাতে। একটা 'টাগ-অফ-ওয়ার' হল না, বয়া আমার হাতের কাছে এল না, অথচ বিজয়-পতাকা আমারই হাতের মুঠোয় পোঁছে গেল, এটা দেখে সকলে একসঙ্গে এতটা ভ্যাবা-চ্যাকা খেয়ে গেল যে একটা তুমুল জয়ধ্বনি ওঠার বদলে সমস্ত ধ্বনিই যেন কিসের ধাক্কায় হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। রেফারি গুড়ুম করে খেলা-

শেষের পিস্তল ছুঁড়ে দিলেন এবং তৎক্ষণাৎ প্রচার করে দিলেন—আমিই জয়ী!

এইবার আস্তে আস্তে আমার চারিদিক ঘিরে একটা কোলাহল পড়ে গেল। আমি হঠাৎ মাটি থেকে প্রায় হাতচারেক শূন্যে উঠে গেলুম। অবাক হয়ে দেখলুম—হেডমাস্টার মশায় আমাকে কাঁধে করে নাচতে নাচতে ছুটে চলেছেন। মনে হল আনন্দে পাগল হয়ে গেছেন।

তারপরের ঘটনাবলী আর বেশী বাড়িয়ে বলে লাভ নেই! তবে একটা কথা না বললে গল্পটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। স্পোর্টস-এর শেষে স্কুলের মাঠে হেডমাস্টার মশায় যে মস্ত ভোজের আয়োজন আগেই করেছিলেন সেটা বোঁচকার বিশ্বাসঘাতকতার ফলে প্রায় বাতিল হয়ে যাবার মতো হয়েছিল সেই ভোজপর্ব যাতে সাড়ম্বরে হয়, আবার তার হুকুম হল। খাবারঘরে ঢুকে দেখি—কী আশ্চর্য! নিমন্ত্রিতদের দলে বসে রয়েছেন বাবা!

বাবা বাইরে কোথায় নেমন্তন্ন খেতে যাবেন এইটুকুই জানতুম—তাই বলে সে যে এখানে, তা কে জানত?

হেডমাস্টার মশায় আমাদের পরিচয় শুনে ভারি অবাক হয়ে গেলেন। বাবা তো এতক্ষণ সবই দেখছিলেন—মুখে কিছু বললেন না। আমি পকেট থেকে দমদম্ অ্যাকাডেমির অ্যাড্‌মিশান ফর্মটা বার করে বাবার সামনে ধরে বললুম—এইখানে একটা সই করে দাও বাবা।

॥ ৬ ॥

দমদমের ইস্কুলটায় ভর্তি হয়ে মন্দ লাগছিল না। কলকাতার মতো তো নয়, এখানে ফাঁকা জায়গা ছিল অনেক, তাই খেলাধূলো হতো খুব বেশী। তা ছাড়া, বহুদিন ধরে সাইকেল চালানো শেখবার আমার ইচ্ছে, অথচ কলকাতার রাস্তায় গাড়িঘোড়ার ভয়ে বাবা আমায় সাইকেল চালাতে দিতেন না। জানতুম বড় বড় অ্যাড্‌ভেঞ্চার সাইকেল ছাড়া হয় না! আজব-তত্ত্বে একবার পড়েছিলুম মহীশূরের জঙ্গলে যেখানে ভীষণ বাঘ, যেখানে হেঁটে জঙ্গলের রাস্তা ধরে জঙ্গল পার হওয়া মানেই বাঘের মুখে পড়া, সেই জঙ্গল সাইকেলে চড়ে, বিনা বন্দুকে

অনায়াসে পার হয়েছিলেন এক তরুণ ডাচ পর্যটক। মহীশূরের বনরক্ষক নাকি বিশ্বাসই করতে চাননি। দমদমার ফাঁকা রাস্তায় আমি সাইকেল চালানো শিখতুম আর ভাবতুম আমিও হয়তো একদিন মহীশূরের জঙ্গল দিয়ে সাইকেল ছুটিয়ে যাবো। আমাদের ইস্কুলের ইঁটের রাস্তা ধরে খানিকটা গেলেই প্রকাণ্ড পীচের রাস্তা—তাতে গাড়িঘোড়ার ভিড় নেই। মাঝে মাঝে দু একটা মোটরগাড়ি অথবা বাস্ সোঁ করে চলে যেতে এই মাত্র। এই খোলা জায়গায় এসে হাত-পা ছুঁড়ে ছুটোছুটি করতে পেরে আমার অ্যাড্ভেঞ্চারের ঝোঁকটা আগের মতো ছিল না। আগে একটা ছটফটে ভাব থাকত। মনে হতো বেরিয়ে পড়ি, বাড়ি থেকে পালাই, দেরি আর সইছে না, এখনই কিছু না করলে জীবন বৃথা। এখন মনে হয়, দেরি সইবে, তাড়াহুড়োর কোনো দরকার নেই। অ্যাড্ভেঞ্চারের সুযোগ আসবেই। সুযোগ এলেই তাকে হাতের মুঠোয় মুঠিয়ে ধরব। এইরকম একটা বদল আমার মধ্যে এসেছিল।

পীচের রাস্তা ধরে কখনও কখনও সুবীর-রণেন-দামুদের সঙ্গে, কখনও বা অন্য ছেলেদের সঙ্গে সাইকেল চড়ে আমরা অনেক দূর অবধি বেড়াতে যেতুম। একটা জায়গায় আমরা প্রায়ই যেতুম। সেটা ছিল একটা ডাক্তারি ইস্কুল। ঠিক রাস্তায় ধারেই একটা কাঁচের শার্সি দেওয়া ঘর ছিল। এ-ঘরটার শার্সিগুলোয় আলো লেগে চক্-চক্ করত, তাই খুব কাছে এসে কাঁচের কাছে মুখ দিয়ে না দাঁড়ালে কিছু দেখা যেত না। কাঁচের শার্সি দেওয়া ঘরটাকে দেখে আমাদের কেমন যেন ভয়-ভয় করত, অথচ কাছে গিয়ে ভিতর দিকে উঁকি মারবার লোভও সামলাতে পারতুম না। উঁকি মেরে দেখতে পেতুম ঘরটার ভিতরে নানারকমের অদ্ভুত কল রয়েছে। সে সব কল যে কিসের জন্যে, কাদের জন্যে এবং কি কাজে লাগে তা হাজার মাথা ঘামিয়েও আমরা বার করতে পারতুম না। ডাক্তারি ইস্কুলের বাবুরা কখনও কখনও এসে দু-একটা কল চালাতেন। একটা হাপর ছিল, সেটা ঠেলতে আরম্ভ করলেই একটা চোঙা দিয়ে বিষম তোড়ে নীল রংয়ের আগুন বেরিয়ে আসত। একটা কাঁচের ফ্রেমের ভিতর একটা

ঘড়ির পেণ্ডুলাম দুলত, অথচ ঘড়ি-টড়ি কিছুই ছিল না—কেন যে খামকা সেটা দুলছে, এটা আমাদের ভারি আশ্চর্য লাগত। একদিকে একটা টেবিলে একসারি জল-ভরা সবুজ রংয়ের কাঁচের বুয়াম সরু সরু তার দিয়ে এটার সঙ্গে ওটায় যোগ করা থাকত। আমরা বলাবলি করতুম, ওটা নিশ্চয় একটা টেলিফোন। এমনি আরও নানারকম-বে-রকমের জিনিস ছিল—যা দেখে আমরা অবাক হয়ে যেতুম, কিছুই বুঝতে পারতুম না।

যত বুঝতুম না তত আমাদের ঔৎসুক্য বাড়ত, জানবার ইচ্ছে হত। কিন্তু কাঁচের বাধা ঠেলে ভিতরে যাওয়ায় অথবা যন্ত্রগুলো কী কাজে লাগে তা জানবার আমাদের কোনো উপায় ছিল না।

তাই সুবীর একদিন বললে—দেখ আমি ঠিক করে ফেলেছি বড় হয়ে আমি কী হব। ডাক্তার হব।

রণেন বললে—হ্যাঃ, তুই করে ডাক্তার হবি, তারপর ঐ কলগুলোর ব্যবহার আমাদের বোঝাবি, আমরা ততদিন অপেক্ষা করে থাকি আর কি। দরকার নেই ও-সব কল বুঝে, ওর চেয়ে ঢের ভালো ভালো বড় বড় যন্ত্র নিয়ে আমি যখন কাজ করব, তখন একবার আসিস আমার কাছে, বুঝিয়ে দেব।

দামু বললে—তুই কী হবি রে?

রণেন বললে—কেন, ইঞ্জিনীয়ার।

আমি বললুম—দামু, তুমি কী হবে?

দামুর বদলে সুবীর জবাব দিল। বললে—জানো না, ওকে তো আমরা দামু বলি না আজকাল। ওর আসল নাম দামোদর কিন্তু আমরা বলি দামাল। বড় হয়ে ও সোলজার হবে—যুদ্ধে যাবে।

দামু-বললে—হ্যাঁ রে হ্যাঁ, তখন তোদের আমি ট্যাঙ্ক আর অ্যান্টি-এয়ারক্রাফ্‌ট কামান দেখাব—আসিস্ একবার আমার কাছে।

রণেন বললে—তুমি কী হবে বাবুই?

আমি বললুম—তা-ও জানো না? আমি হবো পর্যটক। বড় বড় অ্যাড্‌ভেঞ্চার করব।

—শুধু অ্যাড্‌ভেঞ্চার? আর কিচ্ছু না?

—আবার কী? ওতেই তো সময় কেটে যাবে! বড়-বড়

অ্যাড্‌ভেঞ্চার এক-একটা ছ-সাত-মাস, এমন কি দু-বছর তিন-বছরও তো গড়ায়।

কাঁচের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে এমনি ধারা আমাদের নানারকম কথা হত, গল্পগুজব হত, আর মাঝে মাঝে উঁকি মেরে দেখতুম। ভিতরে ঢোকবার সাহস বা সুযোগ কোনদিন হয়নি। কিন্তু কপালক্রমে একদিন তাও জুটে গেল।

সেদিন আমার সঙ্গে ছিল দামু অর্থাৎ দামাল আর ইস্কুলের আরো তিনজন নামকরা দুষ্টু ছেলে গজা, নেপো আর শ্যামু। কঁাচের শার্সি চক্‌চক্‌ করে বলে কাছে না এলে ভিতরটা দেখা যায় না। সেদিন কাছে এসে কাঁচের গায়ে মাথা ঠেকিয়ে দেখি ভিতরে একটি চশমাপরা বাবু আস্তিন গুটিয়ে যন্ত্র নিয়ে কি কাজ করছেন। দেখে আমি সরে গিয়েছিলুম। কিন্তু দামাল আর অন্য ছেলেরা কাঁচের গায়ে লেপটে রইল। ভদ্রলোক একবার মুখ তুলে দেখলেন, তারপর কি ভেবে জানি না, সোজা এগিয়ে এসে একটা কাঁচ-বাঁধানো দরজা খুলে আমাদের ভিতরে ডাকলেন। সত্যি কথা বলতে কি, প্রথমটা আমার বড় ভয় হয়েছিল। সঙ্গীদের মুখের দিকে চেয়ে দেখি তারাও মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। তারপরেই বড় লজ্জা হল। মনে হল, এই সাহস নিয়ে অ্যাড্‌ভেঞ্চার করতে গিয়েছিলুম? এ-ও তো একটা অ্যাড্‌ভেঞ্চারের দরজা আমার সামনে খোলা—অজানা ঘর, অজানা সব যন্ত্রপাতি, অজানা অধিবাসী আমাদের আহ্বান করছেন, এখন কি ভয়ে পিছিয়ে আসা চলে, না দ্বিধা করা চলে? আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলুম। বন্ধুরাও আমার পিছনে পিছনে ঘরে এসে ঢুকল।

চশমাপরা বাবুটি আমাদের একটা প্রকাণ্ড গামলার কাছে নিয়ে গেলেন। গামলার জলের মধ্যে দুটো জলভরা বোতল উপুড় করা রয়েছে! জলের মধ্যে ডোবানো দুটো তার—তাদের গা থেকে অনবরত বুদ্বুদ বেরিয়ে সেই বোতল দুটোর মধ্যে জমা হচ্ছে। আমার সঙ্গীরা যতক্ষণ অবাক হয়ে সেই অদ্ভুত ব্যাপারটা দেখছিল আমি তখন একটা দরজা ফাঁক করে পাশের ঘরটায় কি আছে তাই দেখতে গেলুম। কিন্তু যা দেখলুম তাতে আমার মুখ দিয়ে আর কথা সরল না। ঘরটা নানারকম

ওষুধ-ভরা কাঁচের শিশিতে ঠাসা, দেওয়ালের গায়ে বড় বড় ছবির বই ঝুলছে—তার কতকগুলোতে মানুষের দেহের নানারকম ছবি, অন্যগুলোতে আঁকা কতরকম ভয়াবহ অসুখের ছবি, বাকিগুলোয় অদ্ভুত রকমের হিজিবিজি—যার কোন মানেই বোঝা দায়। কতকগুলো বুয়ামে হলদে রংয়ের জলে টিকটিকি, বিছে, সাপ, সজারু, অদ্ভুত মাছ আর নানারকমের পোকা ডোবানো রয়েছে। একটা টেবিলের ধারে দু-জন বাবু দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁদের একজনের হাতে একটা জ্যান্ত ব্যাঙ, আর একজনের হাতে একটা ছুরি। ব্যাঙটাকে ফ্যাস্ করে তাঁরা আধখানা করে কেটে ফেললেন। দু-টুকরো হয়ে গেল—একদিকে রইল দুটো ঠ্যাং অপর দিকে দুটো ঠ্যাং। খানিকক্ষণ নড়ে-চড়ে ব্যাঙের দেহ হয়ে গেল স্থির। তখন তাঁরা সেই ব্যাঙের টুকরোদুটো দু-খানা লোহার শিকের উপর টাঙিয়ে দিলেন। তারপর যে তাঁরা কী করলেন কিছু বুঝলুম না—হঠাৎ ব্যাঙের ঠ্যাং-চারটে রীতিমতো এদিক ওদিক লাফাতে লাগল—ঠিক জীবন্ত ব্যাঙের মতো। নিজের চোখকেই বিশ্বাস করা দায় হয়ে উঠল। আমি ভাবলুম, এইবার বোধহয় টুকরো দুটো ওঁরা জোড়া দিয়ে আবার আস্ত ব্যাঙ বানিয়ে দেবেন। একটু ভালো করে দেখব বলে দরজাটা ফাঁক করতে যাচ্ছি এমন সময় সেই চশমাপরা বাবুটি হঠাৎ ধমক দিয়ে উঠলেন—ও হে, ওদিকে যেও না, এখানে এসো।

আমি থতমত খেয়ে চলে এলুম। বোতল দুটো ততক্ষণে হাওয়াতে প্রায় ভরে এসেছে। আমার সঙ্গীরা একমনে তাই দেখছিল।

আমাকে জিজ্ঞেস করল—ও-ঘরে কী দেখলি রে ?

আমি ফিস্‌ফিস্ করে বললুম—ওরে ভাই, সে কী বলব! কাটা ব্যাঙ জোড়া দিচ্ছে।

—বলিস্ কি রে ? ডাক্তাররা সব পারে না কি ? তা হলে তো মরামানুষ বাঁচাতে পারে।

—তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তোরা দেখলে বুঝতিস্। চোখের সামনে ব্যাঙটাকে কাটল, ব্যাঙটা মারল, তারপর সেটাকে বাঁচিয়ে তুলল।

বাহাদুরী নেবার জন্যে একটু বাড়িয়েই বললুম। ব্যাঙের দুটো কাটা

টুকরোকে বেঁচে উঠতে দেখেছি—সে-ও যা আর জোড়া লেগে বেঁচে ওঠা ও তা—অন্তত আমার মতে।

শুনে সঙ্গীদের চক্ষু ছানাবড়া। তারা বলল—চুপি চুপি একবার দেখে আসবো নাকি ?

আমি বললাম—খবরদার ও কাজ করতে যেও না। দেখছ না, এই বাবু কী রকম রেগে আছেন? কথা না শুনলে এখনই ঘাড় ধরে আমাদের বার করে দেবেন। তার চেয়ে দেখা যাক্ এখানে কি হচ্ছে।

বোতল দুটো হাওয়াতে ভর্তি হয়ে যেতেই বাবুটি বোতল দুটি নিয়ে খানিকক্ষণ ওলোট-পালোট করলেন, খানিকক্ষণ ঝাঁকালেন তারপর একটা বোতলে ছিপি এঁটে একটা তোয়ালে দিয়ে সেটাকে মুড়ে আমাদেব বললেন এসো।

কি হয় দেখবার জন্যে আমবা সেই যেখানে তোড়ে নীল রংয়ের আগুন বার হত সেইখানে গেলুম। বাবুটি সেই তোয়ালে-জড়ানো বোতলটি নিয়ে সেই নীল রংয়েব আগুনের যথেষ্ট কাছে গিয়েছিলেন বলে মনে পড়ে, কিন্তু তার পরে যে কি হল কিছুই বুঝলুম না। কিছু বোঝবার আগেই—দুড় দড়াম্—করে একটা ভীষণ কান-ফাটানো শব্দ—মনে হল যেন ঘরটা সুদ্ধ ভেঙে পড়ল। আমরা ভয়ে চমকে এ-ওর ঘাড়ে গিয়ে পড়লুম—বুকে হাত দিয়ে দেখলুম বুকটা ঢিপ্ ঢিপ্ করছে, আর সেই বাবুটি নাক থেকে চশমাটা খুলে নির্লজ্জের মতো হো হো করে হাসছেন—যেন খুব একটা গাধা বানিয়েছেন আমাদের। আমরা ভাবছি, কি করব, কি বলব, এমন সময় দরজা খুলে তিনি আমাদের বেরিয়ে যেতে বললেন। আমরা বোকার মতো আস্তে আস্তে বেরিয়ে পড়লুম।

সঙ্গীদের সে কী রাগ! বাইরে বেরিয়ে এসে ঐ ঘটনা নিয়ে তুমুল আলোচনা চলতে লাগল। আমার কানে কিন্তু সব কথা যাচ্ছিল না, কারণ আমার মাথায় তখনও ঘুরছিল সেই ব্যাঙটার কথা। কেবলই মনে হচ্ছিল কী অবাক মন্তরে কাটা ব্যাঙ্কে এরা বাঁচিয়ে দিলে। যদিও দেখিনি, তাহলেও আমি তখন বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছি যে সত্যিই ওরা টুকরো দুটোকে জোড়া দিয়ে দিয়েছে। যতই এটা ভাবছিলুম, ততই অবাক হয়ে যাচ্ছিলুম।

আমার সঙ্গীরা তখন ভাবছে, কী করে তাদের অপমানের শোধ নেওয়া যায়। তারা হলো দমদমার নামজাদা ডানপিটে ছেলে—কোনো রাজা-রাজড়ারও তোয়াক্কা রাখে না—তাদের কিনা ঘরের ভিতর ডেকে অমনি করে অপমান!

নেপো বললে—এর শোধ যদি না নিতে পারি, নিজের কানই কেটে ফেলব।

গজা বললে—আমি যদি শোধ না নিতে পারি আমার নামে তোরা কুকুর পুষিস।

দামু বললে—দূর, গজা আবার কুকুরের নাম হয় নাকি? তুই বরং নিজের নাম বদলে টেমি রাখ্, তাহলে সুবিধে হবে।

গজা বললে—দেখ আরো রাগাস্ নে—তাহলে তোকে ধরেই পিটবো।

দামু বললে—ঝগড়া রাখ, মাথা ঠাণ্ডা করে শোন। ঐ চশমাপরা বাবুটাকে রোজই কলকাতায় যেতে হয়। রাস্তার ধারে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকব। রাস্তা ফাঁকা থাকলে আচ্ছা করে পিট্টি দেওয়া হবে। রাজী আছিস্ তো সবাই?

আর সবাই রাজী হল, আমি বললুম—আমি পারব না। কারণ অপমানই করুক আর যাই করুক, ডাক্তারি ইস্কুলের বাবুদের সঙ্গে আমার ভাব রাখতে হবে—ব্যাঙের রহস্যটা আমি ভেদ করতে চাই।

ছেলেরা আমায় ভীরু আখ্যা দিয়ে ত্যাগ করে চলে গেল। আমার মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগল কাটা-ব্যাঙ্ জোড়া দেওয়া কলটার কথা। ব্যাঙের টুকরো দুটোকে লাফাতে দেখে এসেছি, তারপর কী হল? দুটো সম্ভাবনা আছে—হয় দুটোয় জোড়া লেগে গেছে, না হলে দু-টুকরো থেকে দুটো ব্যাঙ্ হয়ে গেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস নিশ্চয় একটা কিছু অতি অদ্ভুত কাণ্ড ঘটেছে! আমার মন ভারি অস্থির হয়ে উঠেছিল! ভাবলুম, অন্ধকার হলে যখন সবাই চলে যাবে, সেই সময় একবার চুপিসাড়ে পারি তো ব্যাঙের ঘরে ঢুকে কলটাকে ভালো করে দেখে আসব। একটু ঘাঁটলেই বোঝা যাবে কী হয় না-হয়। যদিও ঘেন্না করবে তাহলেও নাক-মুখ বুজে একটা ব্যাঙ ধরে কেটে

কিছু একটা এক্স্‌পেরিমেণ্ট করে দেখলেও মন্দ হবে না। এই সব ভেবে সেদিন ইস্কুল ছুটি হবার পরও আমি দমদমায় রয়ে গেলুম।

তখন সূর্য ডুবে গেছে। শার্সি দেওয়া ঘরটার সামনে এসে দেখলুম, কেউ কোথাও নেই। সাহসে ভর করে কাঁচের দরজাটা আস্তে আস্তে ঠেললুম। ফুস করে খুলে গেল। ঘরটার মধ্যে সবে মাত্র পা বাড়িয়েছি, এমন সময় কঁ্যাচ্‌ করে একটা আওয়াজ হল। দেখি যে ব্যাঙের দরজাটা আস্তে আস্তে খুলছে। কে যেন ঠেলছে। আমি একটু লুকোবার মতো জায়গা খুঁজতে যাচ্ছি, কিন্তু তার আগেই ধরা পড়ে গেলুম। দেখলুম সকালবেলা যে চশমাপরা বাবুটি আমাদের ভীষণ আওয়াজ শুনিয়ে চমকে দিয়েছিলেন, তিনি। কিন্তু তারপরই এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। বাবুটি আমায় দেখেই হঠাৎ ভয়ে ছুটে ব্যাঙের ঘরে ঢুকে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিলেন। কেন যে ভয় পেলেন বুঝলুম না। খানিকক্ষণ অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। তারপর একটা কৌতূহল জাগল—ভাবলুম ব্যাপারটা কী দেখাই যাক। এগিয়ে গিয়ে দরজাটা আস্তে আস্তে ঠেলতে লাগলুম। খুললো না। ভিতর থেকে ছিটকিনি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কি করব ভাবছি, এমন সময় চোখে পড়ল, দেওয়ালের কোণে একটা যে ঘুলঘুলির মতো ছিল তারই ভিতর দিয়ে সেই বাবুটির চশমাপরা চোখ জোড়া আমারই দিকে তাকিয়ে। আমার চোখে চোখ পড়তেই তিনি তাড়াতাড়ি সরে গেলেন। ভাবলুম, লোকটা পাগল হয়ে গেল নাকি!

ডাক্তারি ইস্কুলের কাণ্ডকারখানা বোঝা ভার। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম। ভাবলুম, ধরা যখন পড়ে গেছি, দেখা যাক না কী হয়। ও-বেলার মতো এ-বেলাও হয়ত চশমাপরা বাবুটি দরজা খুলে আমায় ভিতরে যেতে ডাকবেন। কোনো একটি এক্স্‌পেরিমেণ্ট দেখাবেন। কিন্তু কিছুই হল না। দাঁড়িয়ে থেকে থেকে বিরক্ত হয়ে গেলুম। কাঁহাতক আর অপেক্ষা করা যায়—বেরিয়ে পড়লুম। ডাক্তারি ইস্কুলটা, কোনোদিন দেখিনি। ঠিক করলুম, পায়চারি করে ঘুরে-ঘুরে একটু দেখা যাক। ইস্কুলটা যে এত বড়, তা এর আগে জানতুম না। একটার পর একটা বাড়ি। দু-তিনটে বাড়ির চারিদিকে ঘুরলুম। দেখলুম, এক-একটা বাড়িতে

এক-একটা সাবজেক্ট্‌ পড়ানো হয়। আমাদের ইস্কুলে একটা ক্লাসরুমেই সব সাবজেক্ট পড়িয়ে দেওয়া হয়—আর এদের বেলা এই এলাহি কাণ্ড—না জানি কী রকম ইস্কুল এটা! সামনেই একটু দূরে একটা দোতলা বাড়ি। সেইদিকেই যাচ্ছিলুম। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছিল। তার উপর রাস্তার দু-পাশের ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া কয়েকটা গাছের ছায়ায় আরও বেশী অন্ধকার বোধ হচ্ছিল। অজানা জায়গায় গাছতলা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গা-টা যে একটু ছম্‌ ছম্‌ করছিল না, এ কথা বলব না। এমন সময় আমার পিছনে যেন কার পায়ের শব্দ পেলুম—শুকনো পাতার উপর পা পড়লে যেমন খস্‌ খস্‌ শব্দ হয় ঠিক তেমনি। চমকে উঠে পিছনে তাকালুম। একটা সাদা মতো কি গাছের আড়ালে মিলিয়ে গেল। কী ওটা? তাকিয়ে রইলুম সেইদিকে খানিকক্ষণ। কিছু চোখে পড়ল না। মানুষ না কোনো জন্তু না আর কিছু? পাশেই হাসপাতাল। কতরকমের লোক দিনরাত মরছে তার ঠিক নেই। প্রেতাত্মা নয় তো? বলা যায় না। মনে সাহস আনবার চেষ্টা করতে লাগলুম। কিন্তু সেই ছায়া-ঢাকা রাস্তার ধারের সারি-সারি কালো কালো গাছের গুঁড়ি আর নিকটস্থ হাসপাতালের কথা ভেবে থেকে থেকে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠতে লাগল। যেদিকে সাদা মূর্তি দেখে-ছিলুম সেদিকে আর তাকাবার সাহস হল না। জোরে জোরে পা ফেলে সেই গাছে-ঘেরা রাস্তাটুকু কোনরকমে পার হয়ে চলে এলুম। সামনেই দোতলা বাড়িটা—তার কাছে এসে থমকে দাঁড়ালুম। কেউ কোথাও নেই। দরজা-জানলা সব বন্ধ। কিসের বাড়ি বুঝতে পারলুম না। এবার ফিরতে হয়। ফিরে গিয়ে ব্যাঙের ঘরটায় ঢোকবার আর একবার চেষ্টা করতে হয়। কিন্তু ফেরবার পথ তো কালো কালো গুঁড়ির মাঝখান দিয়ে ছায়া ঘেরা ঐ রাস্তাটি। ওখান দিয়ে যাবে কে? ও ছাড়া তো আর কোনো রাস্তা নেই। ব্যাঙের কল দেখা আমার মাথায় চড়ল।

স্থাণু হয়ে সেখানে কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলুম জানি না। সেই খস্‌ খস্‌ শব্দটা মাঝে মাঝে পাচ্ছিলুম, মনে হচ্ছিল, আমারই দিকে এগিয়ে আসছে। কিন্তু সেদিকে তাকাবার সাহস হয়নি আমার। হঠাৎ দেখি আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে প্রেতাত্মা তো নয়—সেই চশমাপরা বাবুটি! কী রকম অদ্ভুত করে আমায় দেখছেন।

আমি কি একটা বলতে যাবো সেই সময় বাবুটি—গদাই, গদাই—বলে ভীষণ গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন। আমি কিছুই বুঝতে পারলুম না। বাবুটির ডাক শুনেই হয় তো দোতলা বাড়ির পাশ থেকে দু-হাতের আস্তিন গোটানো মোটা-সোটা একজন লোক ছুটে এলেন।

চশমাপরা বাবুটি বললেন—ধর গদা ছোঁড়াটাকে।

বলতেই গদাই বজ্রমুষ্টিতে আমায় চেপে ধরল।

কী হল কিছুই বুঝলুম না। আশ্চর্য মানুষ এই চশমাপরা বাবুটি। প্রথমে আমায় দেখে ভয় পেয়ে গেলেন। ভয় পেয়ে লুকিয়ে রইলেন ঘরের মধ্যে দরজা এঁটে। তারপর চুপি চুপি এলেন আমার পিছনে পিছনে। গাছের আড়ালে সাদা ছায়ার মতো যেটা মিলিয়ে পড়েছিল, সেটাও নিশ্চয় এঁরই দেহ! তারপর আর একজনের সাহায্যে আমাকে গ্রেপ্তার করলেন—এসবের অর্থ কী?

এঁরা আমায় টেনে নিয়ে চললেন সেই দোতলা বাড়ির এক বারান্দার দিকে। বেশ চওড়া এক ফালি বারান্দা—কেউ কোথাও নেই। বারান্দার এক কোণে পড়ে আছে কতকগুলো খালি বস্তা। সেখানে একটা দরজা। চশমাপরা বাবুটি দরজা খুলে ধরলেন। গদাই আমার কব্জি ছেড়ে পিঠে মারলে এক জোর ধাক্কা। আমি ছিটকে গিয়ে পড়লুম ঘরের মধ্যে। দরজা বন্ধ হয়ে গেল। শুনলুম কড়াক্ করে বাইরে চাবির কল পড়ে গেল। কুঠরি মতো একটা ঘর। ঘরের ভিতরটা ভীষণ ঠাণ্ডা। আমার হাত-পা সমস্ত হিম হয়ে এল।

বারান্দায় কথা কইতে কইতে দু-জনে চলে যাচ্ছেন শুনলুম।

—আচ্ছা জ্বালিয়েছে ছোঁড়াগুলো গদাই।

—তা তুমি ওদের খামকা অমন ভয় দেখাতে গেলে কেন? সেই রাগেই তোমায় ঠেঙিয়েছে নিশ্চয়!

—আরে ছোঁড়াগুলো প্রায়ই ঘুর ঘুর করে। ল্যাবরেটারি এক্স-পেরিমেণ্ট দেখতে এসেছিল, আমি হাইড্রোজেন-অক্সিজেন মিশিয়ে এক্স-প্লোশান করে দেখিয়ে দিয়েছি। ওদের সখ মেটা উচিত।

—সখ মিটেছে তোমার কান টেনে। আর কি-কি করলে ভাই ওরা?

—গালে চড়, পিঠে কিল!

—হাঃ হাঃ হোঃ হোঃ হোঃ!

—হেসো না, তোমার হলে তুমিও বুঝতে। একজন ছোরা হাতে ভয় দেখাচ্ছিল, নইলে কি আর আমি পড়ে পড়ে মার খাই?

—হাঃ হাঃ হাঃ, ছোরা না পেন্সিল-কাটা ছুরি!

—একই কথা, ব্লেড তো আছে। এ ছোঁড়াটার হাতে ছিল কি না কে জানে? ঐ ভয়ে তো আমি একা ধরতে সাহস করিনি।

—আচ্ছা, তোমার সাহস খুব জানা গেছে। এখন মড়াটাকে আমার সঙ্গে ডিসেক্ট্ করবে নাকি? আমি তো আরম্ভ করেই দিয়েছি।

—হ্যাঁ চলো চলো। আমি ব্যাণ্ডটা শেষ করে এ-দিকেই আসছিলুম।

বারান্দার এ-প্রান্ত থেকে ধীরে ধীরে কথার স্বর নামতে নামতে ও প্রান্তে গিয়ে মিলিয়ে গেল। আমি সেই ঘুটঘুট্টি অন্ধকারের মধ্যে একা পড়লুম।

ব্যাপারটা এতক্ষণে পরিষ্কার হল। ছেলেরা সুযোগ পেয়ে আজই তাদের অপমানের শোধ নিয়েছে। হয়তো তিনি কোনো কারণে রাস্তায় বেরিয়েছিলেন, সেই সময় ছেলেরা পেয়েছে তাঁকে বাগে। কিন্তু ছেলেদের সবার সব দায়-দোষ একা আমার ঘাড়ে এসে পড়ল, এ কি বিপত্তি! তা ছাড়া এ কোথায় এরা আমায় অন্ধকার ঘরে বন্দী করে রাখল বুঝতে তো পারছি না। বললে তো মড়া কাটতে যাচ্ছি। এখন আমি কি করি!

ঘরটা এত ঠাণ্ডা যে রীতিমতো শীত করে এল। শীতের চোটে আর বসে থাকতে পারলুম না। উঠে দাঁড়াতে যাবো, পায়ে একটা কি ঠেকে হুমড়ি খেয়ে নরম একটা কিসের উপর পড়ে গেলুম। সঙ্গে সঙ্গে ঘ্যাও ঘাঁাও ঘ্যাঁস্ ঘ্যাস্ ঘ্যাঁস্ করে একটা বিদ্ঘুটে শব্দে ঘরটা কেঁপে উঠল। যে জিনিসটার উপর পড়ে গিয়েছিলুম, দেখি সেটা একটা মৃতদেহ। কিন্তু মড়া কি শব্দ করে না কি? রীতিমতো মানুষের বিকৃত গলা! মরামানুষ কি জ্যান্ত মানুষকে ভয় দেখায়? যাই হোক,

বুঝলুম, এটা মুর্দা-ঘর তাই এত ঠাণ্ডা। আর এক দিকের একটা দরজার ফাঁক দিয়ে ফিতের মতো আবছা একটু আলো দেখা যাচ্ছিল। কাঁপতে কাঁপতে সেই দিকে গিয়ে দরজার কাছে বসে পড়লুম। দরজাটা যেন আলগা ঠেকল। ঠিকই তো। একটু ঠেলতেই দরজাটা খুলে গেল। এ-দিকটা বন্ধ করতে ওরা বোধহয় ভুলে গেছে। একটা পালাবার পথ পাওয়া গেল তাহলে। হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। কানের মধ্যে তখনও আমার ঘ্যাঁও ঘ্যাস্ শব্দটা বাজছিল।

যে ঘরে এসে ঢুকলুম সেটাও অন্ধকার, তবে আগেরটার মতো নয়। স্যাঁৎসেতে মেঝে—কোনো জায়গা উঁচু, কোথাও বা নীচু। হামাগুড়ি দিয়েই চললুম। খানিকটা চলেই হঠাৎ থমকে বসে পড়লুম। সামনেই চোখে পড়ল, মাটি থেকে এক হাত উপরে শূন্যে একটা নরকঙ্কাল স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। প্রথমে গা-টা শিউরে উঠেছিল, তার-পরই মনে-মনে বললুম—ডাক্তারি ইস্কুলে একটা কঙ্কাল থাকবে এ আর আশ্চর্য কী? বেশ একটু সাহস করেই তার পাশ দিয়ে হেঁটে চলে গেলুম। সঙ্গে সঙ্গে খট-খট-খট-খট করে সমস্ত কঙ্কালটা নড়ে উঠল। বাস্, আমার চোখ-কান-হাত-পা সমস্ত অবশ হয়ে এল।

কেমন করে যে চৌকাঠ পার হয়ে একটা প্রকাণ্ড হল্-এর মতো ঘরে গিয়ে পড়লুম তা আমি নিজে টের পাইনি। কিসের একটা ঝাঁঝালো গন্ধের সঙ্গে একটা আঁষ্টে গন্ধ মাথার মধ্যে ঢুকে সব যেন কেমন গোলমাল করে দিল। হাতড়ে চলতে গিয়ে আবার একটা কিসের সঙ্গে ধাক্কা লেগে গেল। হাত বুলিয়ে দেখি টেবিলের উপর একটা মড়া শুয়ে রয়েছে। চমকে উঠে অন্য দিকে পা বাড়ালুম। সেদিকেও আর একটা মড়া। যেদিকে যেতে চাই চতুর্দিকেই মড়া। সেই আবছায়া অন্ধকারে চোখের দৃষ্টি যখন একটু সয়ে এলো, চেয়ে দেখলুম সমস্ত ঘরটার মধ্যে রাশি রাশি মড়া গিশ্‌গিশ্ করছে—তারা কেউ বসে, কেউ শুয়ে, কারো মাথা নেই, কারো হাত-পা কাটা, কারো সর্বাঙ্গ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, অস্থি বার করা। আমি সেই ঘরের মধ্যে ধপ্ করে বসে পড়লুম। মাথার মধ্যে ঝিম্‌ঝিম্ করতে লাগল। মনে হতে লাগল—যেন আমার চারপাশে কারা অতি সন্তর্পণে নিঃশ্বাস

ফেলছে। যেন মৃতদেহগুলো ধীরে ধীরে তাদের টেবিলের শয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে ঘিরে ফেলবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে।

কতক্ষণ এ-রকম ছিলুম জানি না। বোধহয় বাইরে তখন আঁধারের কোলে সন্ধ্যা মিলিয়ে যাচ্ছে, কারণ ঘরটা অন্ধকার হয়ে এলো। হঠাৎ চোখে পড়ল ঘরের কোণে একটা নীল রঙের পর্দার আড়াল থেকে একটা ক্ষীণ আলোর রেখা আসছে। এতক্ষণে আলো দেখে মনে একটু বল পেলুম। পা টিপে টিপে চললুম সেইদিকে এগিয়ে। পর্দার ফাঁক দিয়ে সেই মিটমিটে আলোয় চোখে পড়ল দু-খানা লোমশ হাত, এক হাতে একটা ধারালো একরত্তি ছুরি, অন্য হাতে একটা সন্না নিয়ে একটা মড়াকে কাটছে।

গদাইয়ের গলার শব্দ পেলুম। পর্দাটা হাতে করে আর একটু ফাঁক করলুম। দেখলুম গদাই আর সেই চশমাপরা বাবুটি একটা মড়াকে প্রায় কোলের উপর টেনে নিয়ে ছুরি দিয়ে কাটছেন।

গদাই বলছিল—ওরে সে ছোঁড়াটার কি হল একবার দেখা দরকার নয়?

শিক্ষা হোক না আচ্ছাসে। থাকুক। বুঝুক ভালো করে আমাকে পিটুনি দেওয়ার ফল!

—তা তো বুঝলুম। এদিকে পেট ফাঁপা মড়ার ঘরে ওটাকে রেখে এসেছিস খেয়াল আছে? মড়াটা যদি ফোঁস্ ফোঁস্ করে ওঠে আর ছোঁড়াটার দাঁত-কপাটি লেগে যায়?

—ভালোই হয়। আর এদিকে আসবে না কোনোদিন আমাদের জ্বালাতে।

—আরে সেদিন যদু ক্লার্ক-এর কি হয়েছিল শুনেছিস তো?

—না, শুনি।

—যদু ক্লার্ক স্কেলিটনের ঘরের ভিতর দিয়ে সেদিন মুর্দা-ঘরে যাচ্ছিল একটা লাস দেখতে। কঙ্কালটার মধ্যে ঢুকেছিল ইঁদুর। খট খট করে উঠতেই অঁা অঁা করে যদু ক্লার্ক মাটির উপর পড়েই অজ্ঞান।

—এ-রকম লোকের ডাক্তারি-ইস্কুলে চাকরি করা কেন বাপু।

যাই হোক একবার খোঁজ নে ছোঁড়াটার কি হল। দু-চার পাক কান মলে এবার ছেড়ে দে—আর কতক্ষণ ভোগাবি ?

—বেশ তাই চল।

বলে দেখলুম ছুরি গুটিয়ে মড়াটাকে এক পাশে ঠেলে সরিয়ে তাঁরা দুজনে উঠে দাঁড়ালেন। আমি আস্তে আস্তে গা-ঢাকা দিলুম। লক্ষ্য রাখলুম কোন দিক দিয়ে তাঁরা বেরোন। তাঁরা চলে যেতেই আমিও চুপি-চুপি সেই দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলুম। দেখলুম ওঁরা কোন দিকে যাচ্ছেন। তার উল্টোবাগে চললুম আমি। পিছনে পড়ে রইল সেই গাছে-ঘেরা ছায়া-ঢাকা পথটা।

তখন অন্ধকার ঘুরঘুট্টি হয়ে গেছে। কোথায় চলেছি জানি না। এ-পথ কোথায় গেছে জানা নেই। অনেকক্ষণ চলার পর রাস্তাটা সরু হয়ে এলো। তারপর পথের দু-ধারে কাঁটালতার ঝোপঝাড় দেখা দিল। শেষে দেখলুম একটা পুকুর ধারে রাস্তাটা শেষ হয়েছে।

সেখান থেকে বেশ স্পষ্ট দেখতে পেলুম ওপারে মিটমিটে লণ্ঠনের আলো জ্বলছে। আর সেই আলোয় দেখা যাচ্ছে কে যেন জলের ধারে বসে ছিপ হাতে মাছ ধরছে।

পাশেই ছিল একটা প্রকাণ্ড বটগাছ। বড় বড় শিকড়ে ছাওয়া গাছের তলাটা। তার চারদিকে সরু সরু ঝুরি নেমেছে। মোটা একটা শিকড়ের উপর গিয়ে বসলুম আমি ভাবতে। খানিকক্ষণ জিরিয়ে মাথাটা ঠাণ্ডা করা দরকার। যতদূর মনে হয়, এটা ডাক্তারি ইস্কুলের পিছন দিকটা। কাছাকাছি বড় রাস্তাটা কোথাও আছে। সেইখানেই আমার পৌঁছোনো দরকার। কান খোলা রাখলুম, যদি কোনো শব্দ পাওয়া যায়—যাতে অন্তত বুঝতে পারি রাস্তাটা কোনদিকে।

এমন সময় চিঁ হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ—চিঁ হিঁ হিঁ—শব্দে হঠাৎ সমস্ত জায়গাটা কেঁপে উঠল। আর বেশ স্পষ্ট শুনলুম, খটাখট্ খটাখট্ করে একটা ঘোড়ার খুরের শব্দ ক্রমেই আমার দিকে এগিয়ে আসছে। মনে পড়ল, ডাক্তারি ইস্কুলের পিছন দিকটায় গরু-ঘোড়ার হাসপাতাল। সেখানে ঘোড়া-ভূতের ভয়ে লোকে দিনের বেলাতেও যেতে সাহস করে না। আমি কি এই রাত্তিরে সেই ঘোড়া-ভূতের আস্তানায় এসে পড়লুম

নাকি? ঘোড়ার পায়ের শব্দ ক্রমেই এগিয়ে আসছিল। প্রতি মুহূর্তেই ভাবছিলুম, এইবার হয়তো দেখবো, একটা মানুষের কঙ্কাল একটা ঘোড়ার কঙ্কালের উপর চড়ে টগবগ করে ছুটে আসছে। সামনের দিকে চেয়ে দেখলুম ওপারে সেই লণ্ঠনটা তখনও জ্বলছে। ছিপ হাতে কে একটা বসে আছে বটে—কিন্তু লোকে তো দিনের আলোতেই মাছ ধরে; এই রাত্তির বেলায় ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে মাছ ধরছে এ কে?

হঠাৎ কিট্ কিট্ কিট্ কিট্ ছিপের সুতো ছাড়ার আওয়াজ পেলুম। একটা মাছ গেঁথেছে বোধ হয়। ওপারের লোকটা ছিপ হাতে উঠে দাঁড়িয়ে আনন্দের চোটে—গেঁথেছে; গেঁথেছে—বলে চীৎকার লাগিয়ে দিল।

কিট্ কিট্ কিট্ কিট্—কিট্ কিট্ কিট্ কিট্…।

মানুষের গলার শব্দ শুনে আমার তখন ভূতের ভয় ভেঙে গেছে। গলাটা চেনাচেনা বোধ হল! পুকুর পাড়ে বিশেষ কোনো রাস্তা খুঁজে পেলুম না। এটা ডিঙিয়ে, ওটা মাড়িয়ে, সেটা চষে ওপারে পৌঁছে দেখলুম—তাই তো, এ যে বাবা! এই অন্ধকারে দমদমায় মাছ ধরতে এসেছেন—উঃ, সখ কম নয় তো! ঘোড়ার খুরের যে শব্দটা পাচ্ছিলুম সেটা ঠিক আমাদের পিছনে এসেই থেমে গেল। পুকুরের ধারে গাছের বেড়া—তার ওপারেই বড় রাস্তা—অন্ধকারে কিছু চোখে পড়েনি। দেখি সেখানে এসে একটা ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়েছে।

বাবা হঠাৎ আমায় দেখতে পেয়ে বললেন—আরে বাবুই যে। বাড়ি যাস্‌নি এখনও? শীগগির ডাক্তারবাবুকে ডেকে আন—দেড়মণী মাছ পড়েছে।

আমি বললুম—ডাক্তারবাবু কে?

বাবা বললেন—আরে ওই যে গাড়ি করে এসেছেন। ডেকে আন না।

বুঝলুম, এই ডাক্তারবাবুর পুকুরেই মাছ ধরতে আসা হয়েছে। কিন্তু হায় রে! ডাক্তারবাবু আসতে আসতেই বাবার দেড়মণী মাছ সুতো ছিঁড়ে পালিয়ে গেল।

ডাক্তারবাবু খুব খানিকটা হেসে বললেন—দেড় মণ আবার মাছ হয় না কি? বংশু, তুমি কি স্বপ্ন দেখছ?

বাবা বললেন—স্বপ্ন মানে? পরিষ্কার সুতোর টানে বুঝলুম দেড় মণ। নইলে ছিঁড়ে যায়? খেলিয়ে টেনে তুললে দেখতে।

তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন—তুই এখানে কি করে এলি বললি না তো? আবার অ্যাড্‌ভেঞ্চার শুরু করেছিস্ বুঝি?

ডাক্তারবাবুর সামনে ডাক্তারি ইস্কুলের অ্যাড্‌ভেঞ্চারটার কথা বলতে কি-রকম লজ্জা করতে লাগল। তাই বললুম—নাঃ এমনি।

॥ ৭ ॥

গজা, নেপো, শ্যামু, দামু তার পরদিন যখন ফলাও করে আমায় বলতে এল, কেমন কায়দা করে তারা ডাক্তারি ইস্কুলের বাবুটিকে শিক্ষা দিয়েছে, বাবুটি নাকি টেরও পাননি কারা তাঁকে অমন করে মেরে-ধরে অপমান করে গেল, আমি চুপ করে শুনে গেলুম। একবারও তাদের বললুম না যে বাবুটি ভালো রকমই টের পেয়েছেন, কারা তাঁকে ঠেঙিয়েছে। ইচ্ছে করলে হেডমাস্টার মশায়ের কাছে নালিশ জানাতে পারতেন। তাহলে ছেলেদের রীতিমতো শাস্তি হত। তা না করে তিনি শোধ নিয়েছেন একা আমার ওপর। এ-যাত্রা আমার বন্ধুরা বেঁচে গেল এবং খুশী মনেই রইল এই দেখে আমি আর কিছু বললুম না।

দমদম্ অ্যাকাডেমির নাম-করা দুষ্টু ছেলে হলেও গজা, নেপো, শ্যাম, দামু আমার বন্ধু। সুবীর আর রণেনের সঙ্গে সাইকেল করে বেরিয়েছি বটে কিন্তু সাইকেল চড়া শিখিয়েছে আমায় গজার দল। অনেক আছাড় খেয়ে, অনেক আঁচড়, ছড়া, রক্তপাতের ফলে সাইকেল চড়া শিখেছি। এই সাইকেল শিক্ষার মধ্যে দিয়েই আমরা পরস্পরকে জেনেছি। ওরা জানে যে-কোনো বিপদের মুখে আমিও ওদেরই মতো সাহস দেখাতে পারি, যে-কোনো কঠিন অবস্থায় অটল থাকতে পারি ওদেরই মতো। তাই সেদিনের মারামারিতে ওদের সঙ্গে আমি যোগ দিইনি বলে ওরা যখন আমায় ভীরু, কাপুরুষ, মিনমিনে বলে গালাগালি দিতে আরম্ভ করল তখন আমার মনে বড় লাগল। ভেবেছিলুম আমার অ্যাড্‌ভেঞ্চারটার কথা বলব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। কিন্তু ওদের ব্যবহার দেখে আর বলতে ইচ্ছে করল না।

গজা ছিল পালের গোদা। সে-ই সকলের উপরে হুকুম চালাতো। সে বলল—আমাদের দলে যদি কেউ ভীরু থাকে, তাকে শাস্তি পেতে হবে। বাবুইয়ের প্রাপ্য সেই শাস্তি।

আমি মনে-মনে জানতুম আমি ভীরু নই, তাছাড়া বন্ধুদের কুকীর্তির শাস্তি আমি একাই ভুগেছি, কাজেই আমার আর কি শাস্তি পাওনা হতে পারে? তাই বললুম—না, আমার কোনো শাস্তি পাওনা নেই। ভীরুও আমি নই।

—ভীরু নও তো আমাদের সঙ্গে এলে না কেন?

—আমার অন্য কাজ ছিল। তা ছাড়া চুপি-সাড়ে নিরীহ লোকের উপর চড়াও করে তাঁকে মারা—এ-ও আমার পছন্দ নয়।

গজা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল। বললে—আচ্ছা, দেখবি তাহলে।

দেখলুম সেই দিনই। আমার একটা চমৎকার টিফিনের কৌটো ছিল। বাবা দিয়েছিলেন। তাইতে করে আমি টিফিন নিয়ে আসতুম। সেই কৌটোটা ওরা কোন এক সময়ে চুরি করে হাতুড়ি মেরে চ্যাপ্টা করে ফেলে রেখে দিয়ে গেল। টিফিন-কৌটোটা আমার ছিল খুব পছন্দ। অমন কারুর ছিল না। বাজারেও পাওয়া যেত না। বাবা কোথা থেকে এনেছিলেন জানি না। যাই হোক, আমি এ নিয়ে নালিশ জানালুম না। বাবাকে শুধু বললুম, হারিয়ে গেছে। বাবা আর একটা সাদা-মাটা কৌটো আমায় কিনে দিলেন।

তার পর দিন সবাই মিলে বেরিয়েছি সাইকেল করে। মাঝপথে সকলে একবার থেমেছি একটা গাছতলায়, তারপর আবার যাত্রা করতে যাবো, দেখি আমার চাকায় হাওয়া নেই। ওরা আমার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করেই যে-যার সাইকেল নিয়ে হাসতে হাসতে চলে গেল।

আমি একা পড়ে রইলুম সেই গাছতলায়। আমার সাইকেলে কোনো পাম্প ছিল না যে চাকায় হাওয়া দেব। যদি কোনো পথিক সাইকেল করে যান, তাঁকে থামিয়ে পাম্পটা ধার নেব এই আশায় বসে রইলুম। বুঝলুম, গজাদের দলের সঙ্গে আমার সম্পর্ক চুকে গেল। ওরা ত্যাগ করল আমায়। অবশ্য দামুর কথা বলতে পারি না—দামু,

সুবীর-রণেনদের দলেও আছে। দামু তো সোলজার হতে চায়; গজা, শ্যামু, নেপো কি হবে—গুণ্ডা?

এই সব ভাবছি এমন সময় হঠাৎ টের পেলুম, আমার পিছনে কি একটা এসে দাঁড়িয়েছে। পিছন ফিরে দেখলুম, একটা কুকুর। কোথা থেকে এল এটা? ঘুরতেই পা চেটে দিল আর এমন ল্যাজ নাড়তে লাগল যে আমার তখনই তাকে আদর করতে ইচ্ছে করল। কুকুরটা এক-গা বাদামী লোমে ভরা। ঝালরের মতো সুন্দর ল্যাজ। কারো পোষা কুকুর কি না কে জানে—কিন্তু আমায় আর ছাড়তে চায় না। সামনের দুই থাবার উপর মুখ রেখে চোখ উঁচিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বসে রইল।

খানিক পরে দেখলুম, একজন সাইক্লিস্ট আসছেন। কাছে আসতে দেখলুম আমাদেরই ইস্কুলের কেরানীবাবু। তাঁকে দাঁড় করালুম। তিনি পাম্প ধার দিলেন।

জিজ্ঞেস করলেন—কাঁটা লেগেছিল নাকি? লীক্ হয়েছে?

আমি বললুম—না, এমনি হাওয়া বেরিয়ে গেছে।

তিনি ঝুঁকে পড়ে আমার চাকাটা দেখে বললেন—এ তো দেখছি কে ভাল্ভ টিপে হাওয়া বার করে দিয়েছে। সাইকেল ছেড়ে কোথাও গিয়েছিলে নাকি?

আমি বললুম—না যাইনি তো। ভাল্ভ-এরই কোনো দোষ আছে বোধহয়।

—কিচ্ছু দোষ নেই। এই দেখ না।

আমি কী বলব ভাবছি, সেই সময় কুকুরটার দিকে তাঁর চোখ পড়ল।

—আরে, এ কুকুরটা তোমার নাকি?

—কার জানি না, আমার কাছে এসে বসে আছে।

—দিব্যি পোষা কুকুর দেখছি! কার কুকুর? এখান থেকে ক-মাইলের মধ্যে তো কোনো বাড়ি নেই যেখানে এ-জাতের কুকুর পুষবে। কোত্থেকে এলো?

ততক্ষণে আমার হাওয়া দেওয়া হয়ে গেছে। কেরানীবাবুর তাড়া

ছিল। তিনি পাম্প ফেরত নিয়ে সাইকেলে চড়ে দৌড় দিলেন। কুকুর বা ভাল্‌ভ-রহস্য নিয়ে আর মাথা ঘামালেন না।

আমি তখন কুকুরটাকে তাড়া লাগালুম—যা বাড়ি যা। কিন্তু সে নড়ল না। মুখ তুলে ল্যাজ নাড়তে লাগল। আমি সাইকেলে চড়ে বসলুম। ভাবলুম, এইবার পালাবে। কিন্তু কোথায় কি? যত জোরে সাইকেল চালাই কুকুরটাও পিছনে ছোটে।

শেষটা আবার নামলুম। এবারেও একটা গাছতলা। সাইকেলটা গাছে ঠেস্ দিয়ে রাখতে যাবো, চোখে পড়ল, গুঁড়ির মধ্যে একটা কাঠের বল। পুরোনো, চটা-ওঠা, কতকাল ওখানে পড়ে আছে কে জানে? ভাবলুম, বলটা নিয়ে কুকুরটা খেলুক, আমি ততক্ষণ সাইকেলে করে সরে পড়ি। এই ভেবে কুকুরটার মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে বলটা শুঁকিয়ে যত জোরে পারি ছুঁড়ে দিলুম। সঙ্গে সঙ্গে ছুটল কুকুরটা। অনেক দূরে চলে গেল। বলটাকে ধরল কামড়ে তারপর বল নিয়ে ফিরে এল আমার কাছে। যতবার ছুঁড়ে দিই একই ব্যাপার। যত দূরেই যাক, বল খুঁজে নিয়ে এসে আমার পায়ের কাছটিতে রেখে দেয়।

খেলাটা মন্দ লাগছিল না। কতক্ষণ খেলেছি মনে নেই, হঠাৎ হুড়মুড় করে সেখানে এসে পড়ল গজা, নেপো, শ্যামু আর দামু।

গজা বললে—কী রে তুই একটা কুকুর পেয়ে গেছিস বুঝি?

আমি বললুম—ওটা আপনি এসেছে, এখন যেতে চাইছে না।

—বেড়ে কুকুরটা তো। ওটাকে আমরা পুষবো। চল্ নিয়ে যাই।

পোষবার কথা আমার মাথায়ও একটু আগে এসেছিল। ভাবছিলুম সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে গেলে মন্দ হয় না।

বললুম—আমরা পুষবো মানে? সকলে একসঙ্গে!

—হাঁ, বন্ধুদের মধ্যে আবার ভাগাভাগি কী? ইস্কুলে রেখে দেব কুকুরটাকে। সবাই খাওয়াব। সবার কুকুর হবে।

দেখলুম এরা আবার আমার সঙ্গে ভাব করতে চায়। কুকুরের দৌলতেই হয়তো। যাই হোক, আমরা কুকুর নিয়ে ইস্কুলে ফিরলুম। আমার সাইকেলের পিছনে সারা রাস্তা দৌড়তে দৌড়তে এল কুকুরটা।

ইস্কুলে পৌঁছে জিভ বার করে হাঁফাতে লাগল। মালী আমার সাইকেল রাখত। মালীর কাছে কুকুরটাকে জিম্মে করে দিলুম।

সেই থেকে আমাদের পাঁচজনের একটা কুকুর হল। পালা করে আমরা তার জন্যে খাবার নিয়ে আসতুম। ছুটোছুটি করে খেলতুম। কুকুরটা লাফিয়ে উঠত আমাদের কাঁধ অবধি, বল কুড়িয়ে আনত, লাঠি কুড়িয়ে আনত, ভারি বুদ্ধিমান ছিল! দু-পায়ে দাঁড়াতে পারত। হাত বাড়ালে হাত বাড়িয়ে দিত। কথাও বুঝতে পারত অনেক। বই-খাতা মুখে করে নিয়ে যেতে পারত। আরও কত কি করত। কুকুরটার নাম দিলুম আমি—পালোয়ান।

পালোয়ান বলে ডাক দিলে দূর থেকে ছুটে আসত।

এই পালোয়ানকে নিয়ে একদিন ভারি মুস্কিল হল। কি কারণে জানি না গজার সঙ্গে আমাদের ইস্কুলের গোয়ালার বিশেষ বনিবনা ছিল না। ডাক্তারি ইস্কুলের নিরীহ বাবুটিকে যেমন করে মার দিয়েছিল তেমনি করে গোয়ালাকে ঠেঙাবার কথা যে সে ভাবেনি তা নয়, কিন্তু সাহস পেত না। গোয়ালা চিনে ফেলবে ঠিকই, তা ছাড়া তার গায়ে, দুর্দান্ত জোর। তাই একদিন গজা পালোয়ানকে লেলিয়ে দেবার চেস্টা করল গোয়ালার পিছনে। কিন্তু পালোয়ান ছিল ভারি ভদ্র, ভারি বুদ্ধিমান কুকুর। গোয়ালা তো চোর নয়, ডাকাতও নয়। গোয়ালার পিছনে তাড়া করে সে গেল না। চুপ করে বসে রইল। গজার হল অপমান। সে গুম্ হয়ে খানিকক্ষণ বসে রইল, তারপর বললে—পালোয়ানটা নামেই পালোয়ান। আসলে মিনমিনে। ওটাকে তেজী করতে হবে।

নেপো জিজ্ঞেস করল—কি করে তেজী করবি?

—কেন ল্যাজ কেটে দিয়ে! ল্যাজ কেটে দিলে কুকুর তেজী হয় জানিস না?

আমি শিউরে উঠলুম। বললুম—ল্যাজ কাটবি কি? অমন সুন্দর ঝালরের মত ল্যাজ। তা ছাড়া ওর লাগবে না?

গজা বললে—লাগবে তো কি হয়েছে? তুই কি বুঝিস্! আমি ওর ল্যাজ কাটবো।

সেদিন এই পর্যন্ত। ভয় পেয়ে গেলুম। গজা সাংঘাতিক ছেলে—যা বলে করে ছাড়ে। তাই ঠিক করলুম, চোখ রাখতে হবে, কিছু করতে গেলেই বাধা দেব।

ক'টা দিন কিছুই হল না। গজা, নেপো, শ্যামু, দামু পালা করে খাওয়াল পালোয়ানকে। আদর করল কুকুরটাকে, খেলা করল তার সঙ্গে, একটা নতুন বল এনেছিল শ্যামু, সেটা দিয়ে দৌড় করাল। ওঠ-বস্ করার আর-একটা কায়দা শেখাল। মনে হল কুকুরটাকে ওরা ভালই বাসে—ওর উপর কোনো নিষ্ঠুর অত্যাচার করবে না।

সেই সময় একদিন আমি গল্পের বই পড়ছি, দামু এসে বলল—বাবুই শীগ্‌গির যা, ওরা পালোয়ানকে ধরে নিয়ে গেছে ল্যাজ কাটবার জন্যে।

আমি মুখ সাদা করে বললুম—কোথায় ধরে নিয়ে গেছে?

—ইস্কুলের পিছনে, গাছ-ঘরে।

—তুই?

—আমি এলুম তোকে খবর দিতে। আমি ল্যাজকাটার দলে নই। ওদের বোঝাতে চেয়েছিলুম, বুঝল না।

আমাদের ইস্কুলের একটা গাছ-ঘর ছিল, সেখানে মালী টবে করে নানা-রকম গাছ রাখত। মাঝে-মাঝে ইস্কুল সাজানো হত সেই সব গাছ দিয়ে। নির্জন সেই গাছ-ঘরের কাছে পেঁাছেই বুঝলুম ভিতরে একটা ভয়ানক চক্রান্ত চলেছে।

ওরা আমায় দেখতে পেয়েছিল। আমিও দেখতে পেয়েছিলুম গজার হাতে মস্ত একটা ছোরা। সত্যি গুণ্ডার মতো মূর্তি। আমি ঘরের মধ্যে ঢুকতে যাবো, সেই সময় গজার ইঙ্গিতে নেপো আর শ্যামু আমায় এসে ধরল। একটা ঝটাপটি লেগে গেল। আমার গায়ে যথেষ্ট জোর—ওদের দু-জনকেই হয়তো কাবু করতে পারতুম। নেপোর গর্দান জাপটে ধরে ওকে মাটিতে ফেলতে যাচ্ছি, সেই সময় শ্যামুর একটা লাথি এসে সজোরে আমার পেটে লাগল। অমনি চোখের সামনেটা অন্ধকার হয়ে গেল।

কতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে ছিলুম জানি না। যখন চোখ মেলে চাইলুম,

দেখলুম পালোয়ানের কাটা ল্যাজটা সামনে পড়ে রয়েছে। মেঝেতে রক্ত। একমাত্র দামু সেখানে দাঁড়িয়ে। আর কাউকে দেখতে পেলুম না। দামু আমার বগলের তলায় হাত দিয়ে আমাকে উঠিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল। তলপেটের ব্যথাটা তখনও যায়নি। দামু বললে—কি রে, হেঁটে যেতে পারবি ?

আমি বললুম—কুকুরটা কোথায় রে ?

দামু বললে—কেঁউ কেঁউ করে কাঁদতে-কাঁদতে পালিয়ে গেল।

আমি কোনো রকমে চোখের জল চেপে বললুম—আর বাকি কুকুরগুলো ?

—তারাও পালিয়েছে।

আমি তখন খোঁড়াতে খোঁড়াতে গাছ-ঘরের কলে মুখ দিয়ে এক পেট জল খেয়ে নিলুম। জলটা খেয়ে একটু সুস্থ লাগল।

দামুকে বললুম—তুই যা এখন।

দামু বললে—তুই কী করবি ?

—কুকুরটাকে খুঁজতে বেরোব।

—আমিও যাবো তোর সঙ্গে।

—না তোকে আসতে হবে না। আমি একাই যাবো। তুই এখন যা।

দামু চলে যেতে আমি প্রথমেই গেলুম মালীর ঘরে দেখতে পালোয়ান সেখানে এসেছে কি না। মালীকে কাটা ল্যাজটা দেখালুম। মালী ওদের খুব গালাগালি দিল। মালীর কাছ থেকে এক টুকরো খবরের কাগজ নিয়ে তাতে ল্যাজটা জড়িয়ে আমি বেরলুম খোঁজে।

ফিরে গেলুম আবার সেই গাছ-ঘরে। রক্তের চিহ্ন ধরে চলতে হবে। যেখানে কেটেছিল সেখানে রক্তের ছড়াছড়ি। বোধহয় ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটেছিল—জবাগাছের পাতাগুলোতেও দেখলুম রক্তের ফুটকি। অনেকক্ষণ ধরে কান্না চাপছিলুম। গাছ-ঘরে বসে একা কেঁদে নিলুম খানিকটা। মন একটু হালকা হল। তারপর বেরলুম রক্তের চিহ্ন ধরে।

গাছ-ঘর থেকে সোজা বেরিয়ে বড়-রাস্তার দিকে গেছে রক্তের

ফোঁটাগুলো। তখনও শুকোয়নি। বড় রাস্তায় পোঁছে ধুলোর মধ্যে রক্ত-চিহ্ন আর বিশেষ চোখে পড়ল না। অনেক খুঁজে দু-চার জায়গায় লাল-মতো যে ছোপ দেখতে পেলুম তাতে মনে হল, পূব দিকের রাস্তা ধরেই গিয়েছে।

—পালোয়ান! পালোয়ান! বলে ডাকলুম। কিন্তু বৃথা। রাস্তা ধরে কতদূর গিয়েছে কে জানে? রাস্তা ছেড়ে মাঠেই নেমে পড়েছে কি না তা ও জানা নেই। যাই হোক, আমি রাস্তা ধরে পূবমুখো চলতে শুরু করলুম। ঠিক করলুম, অন্ততঃ সেই যেখানে ওকে প্রথম পাওয়া গিয়েছিল সেই গাছতলা পর্যন্ত যাবো।

রাস্তা ধরে চলতে চলতে সমস্তক্ষণ দেখছিলুম রক্তের চিহ্ন কোথাও আছে কি না! কিন্তু কিছুই চোখে পড়ল না! অনেকখানি পথ সেই গাছতলা। সেবারে সাইকেলে গিয়েছিলুম, এবারে পায়ে হেঁটে অনেক সময় লাগল। গাছতলায় যখন পোঁছলুম তখন দিনের আলো ফিকে হয়ে আসছে। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বসে পড়লুম শিকড়ের উপর। এবার যে কি করব, এখান থেকে কোথায় যাবো, কিছুই জানি না। গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগলুম!

একটু আগে আধমাইলটাক দূরে রাস্তার ধারের এক পানের দোকানে জিজ্ঞেস করেছিলুম, তারা রাস্তা দিয়ে কোনো লোম-ওয়ালা বাদামী রংয়ের কুকুর যেতে দেখেছে কি না। তারা বলেছিল, একটা বাদামী রংয়ের কুকুর দেখেছে বটে, কিন্তু লোম-ওয়ালা নয়—নেড়ি কুত্তা—রাস্তা শুঁকতে শুঁকতে যাচ্ছিল।

—ল্যাজ কাটা, না ল্যাজ ছিল?

—লক্ষ্য করিনি।

গাছতলায় একটা জায়গায় হঠাৎ চোখে পড়ল ভন্ ভন্ করে কতকগুলো মাছি ঘুরছে। কেমন সন্দেহ হল। ভালো করে লক্ষ্য করে দেখলুম, যা ভেবেছি তাই—মাটির উপর কালচে-লাল মতো এক চাপ শুকনো রক্ত। বুঝলুম এখানে এসেছিল কুকুরটা—তার সেই পুরোনো প্রিয় গাছতলায়—যেখানে আমার সঙ্গে প্রথম দেখা। কিন্তু এখান থেকে কোথায় গেছে সে? এবার আমি কোন দিকে যাবো?

দিনের আলো নিভে আসছিল। মাটিতে রক্তের দাগ আর চোখে পড়বে না। কিন্তু ফিরে যাওয়ার কথা আমি তখন ভাবতেই পারছি না। বরং ভাবছি, এই রাস্তা ধরে সারা রাত যদি চলতে হয় তা-ও চলব, যতক্ষণ না পালোয়ানকে খুঁজে পাই।

আবার চেঁচালুম—পালোয়ান! পালোয়ান!

রাস্তা দিয়ে দু-জন লোক যাচ্ছিলেন, সন্ধ্যের অন্ধকারে গাছতলায় আমার চীৎকার শুনে বললেন—কাকে ডাকছো খোকা? কেউ হারিয়েছে না কি?

আমি বললুম—কুকুর। পালিয়ে গেছে। রাস্তায় কোনো বাদামী রংয়ের কুকুর দেখেছেন?

তাঁরা বললেন—না দেখিনি। আর এখানে বসে থেকে কি করবে? বাড়ি ফিরে যাও। ফেরবার হয়, কুকুর ঠিক ফিরবে।

আমি তাঁদের কথা অবশ্য শুনলুম না। পালোয়ানকে খুঁজে বার করতে বেরিয়েছি; খুঁজে না বার করে আমি ফিরব না।

সেই সময় দেখলুম, মাঠের মধ্যে দিয়ে একজন লোক আসছেন। চোখে পড়ল, একটু দূরে মাঠের উপর দিয়ে একটি সরু পায়ে-চলা-পথ বড় রাস্তায় এসে মিশেছে।

উঠে গিয়ে সেই লোকটিকে জিজ্ঞেস করলুম—দেখুন, আমার একটি কুকুর হারিয়েছে। এ-রাস্তা দিয়ে কোনো বাদামী রংয়ের কুকুর যেতে দেখেছেন?

হ্যাঁ দেখেছি। আমি যখন আল দিচ্ছিলুম তখন রাস্তা ধরে ঐ দিকে যাচ্ছিল।

—ল্যাজ কাটা?

—দেখিনি।

আর আমায় পায় কে? চললুম সেই পায়ে-চলা রাস্তা ধরে। দেখতে দেখতে অন্ধকার হয়ে এল। মাঝে মাঝে চোখে পড়ছিল রাস্তাটা, মাঝে মাঝে মিলিয়ে যাচ্ছিল তার চিহ্ন। একদিকের ধূ ধূ মাঠ আঁধারি আকাশে গিয়ে মিশেছে। অন্য দিকে এখানে ওখানে বড় বড় গাছ কালো কাপড় মুড়ি দেওয়া দৈত্যের মতো। আকাশে তারা। কোনোরকমে

চলেছিলুম। কতদূর গিয়েছি, কতক্ষণ চলেছি জানি না, ফিকে চাঁদের আলোয় মনে হল গাছে-ঢাকা একটা গ্রাম রয়েছে যেন দূরে। গ্রামের আগেই পথের উপর কাদের যেন একটা বসতি। ভাবলুম, এটাতেই প্রথম খোঁজ করা যাক!

পর পর তিনটে মাটির বাড়ি, সামান্য একটু ঘের দেওয়া। প্রথম বাড়িটার উঠোনে ঢুকেই টিমটিমে তেলের আলোয় চোখে পড়ল কুচকুচে কালো একজন সাঁওতাল উবু হয়ে বসে পালোয়ানের গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। পালোয়ান নেতিয়ে পড়ে রয়েছে মাটিতে।

—পালোয়ান! বলে ডাকতেই পালোয়ান মুখ তুলে তাকাল। কিন্তু ল্যাজও নাড়ল না, উঠেও দাঁড়াল না। ল্যাজ আর কই বেচারার?

সাঁওতালও ফিরে তাকাল আমার দিকে।

আমি খবরের কাগজ খুলে কাটা ল্যাজটা সাঁওতালের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললুম—এই দেখ, ক-জনে মিলে জোর করে আমার কুকুরের ল্যাজ কেটে দিয়েছে। বিকেল থেকে ওকে খুঁজছি।

সাঁওতাল বললে—তোর কুকুর? বলিস কি? এ তো আমার কুকুর মুন্না—কবে পালিয়ে গিয়েছিল। আবার ফিরে এসেছে।

তখন বুঝলুম। এরই কুকুর তাহলে? বড় রাস্তায় চলে এসেছিল। তারপর আমাদের পোষমানা। শেষে আমাদের হাতে মোক্ষম মার খেয়ে তার আপনজনের কাছে পালিয়ে এসেছে।

সাঁওতালটির নাম মুংরি। দমদম ছাড়িয়ে রাস্তা তৈরী হচ্ছে, তাইতে মাটি কাটার কাজ করে। রাস্তা-ইঞ্জিনীয়ার বাবুর বাড়িতেও কিছুদিন কাজ করেছিল। ছেড়ে আসবার সময় ইঞ্জিনীয়ার বাবুর কাছ থেকে একটা বাচ্চা কুকুর পেয়েছিল—এই মুন্না।

মুংরির কাছ থেকে কুকুরটা চাইতে সে তো উড়িয়েই দিল। বললে—দূর, ওকে আমি পুষেছি, তোকে দেব কেন?

আমি বললুম—আমিও তো পুষেছি, যত্ন করিনি এতদিন?

মুংরি বললে—কিচ্ছু যত্ন করিস্‌নি। ল্যাজ কাটা গেল কেন? কোথায় রেখেছিলি ওকে?

তখন আমি সব ঘটনা মুংরিকে বললুম। বলে বললুম—এবার আমি

ওকে আমাদের নিজেদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রাখব। ও আমার একলার কুকুর হবে।

মুংরি বললে—দাঁড়া ওকে আগে বাঁচাই। কত রক্ত ঝরেছে দেখেছিস্? রক্ত তো সব কাবার।

আমার আবার চোখ ঠেলে কান্না এল। ভাগ্যিস অন্ধকার ছিল বলে মুংরি দেখতে পায়নি।

মুংরি বললে—ছেলেকে ওযুধ আনতে পাঠিয়েছি। দেরি হচ্ছে—বোধ হয় খুঁজে পাচ্ছে না।

বলতে বলতেই মুংরির ছেলে বদেন ফিরল। হাতে তার একগোছা শিকড় আর পাতা।

মুংরি বললে—ভাল করে বেটে মাখিয়ে দে। আর, একটু মাংস খেতে দে! জোর পাবে।

বসে বসে সাঁওতালি চিকিৎসা দেখলুম। পালোয়ান একটু আরাম পেয়ে কুঁকড়ি মেরে ঘুমিয়ে পড়ল।

মুংরি বললে—ঘুমোক। যত ঘুমোবে তত উপকার।

তারপর আমার দিকে ফিরে বললে—তুই কোথায় যাবি?

আমি বললুম—মুংরি, আজকের রাতটা আমি তোমার এখানেই থাকবো।

মুংরি বললে—তোর বাপ-মা ভাববে না?

আমি বললুম—ভাবুক। এত রাতে আমার ফেরার উপায় নেই।

রয়ে গেলুম মুংরিদের কুঁড়েয়। মোটা চালের ভাতের সঙ্গে শূয়োরের মাংস খেয়ে পেট ভরালুম, তারপর শুয়ে পড়লুম বদেনের পাশে তার মাদুরে।

নিথর নিঃশব্দ গ্রাম! শুধু ঝিঁঝির গান মাঝে মাঝে। উঠোনে হালকা চাঁদের আলো সজনে গাছের উপর এসে পড়েছে। ঘুম আসতে চায় না। শুয়ে শুয়ে ভাবছিলুম আমার আশ্চর্য ভাগ্যের কথা। অমন-ভাবে হারিয়ে-যাওয়া কুকুরটাকে এতদূরের গ্রামে এসে কেমন করে খুঁজে পেলুম! মুংরি কি আমায় কুকুরটা দেবে? কে জানে? নেহাৎ না দেয়, মাঝে মাঝে এসে খেলে যাবো। এদের কাছে থাকলে ওর নাম

আবার হয়ে যাবে মুন্না। তবে আমি ওকে পালোয়ান বলেই ডাকব। আর যদি পাই? তাহলে আর দমদম-মুখো হব না কোনোদিন। গজাদের সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক রাখব না। ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না।

দেরি করে ঘুম ভেঙেছিল। চোখ মেলে প্রথমেই চোখে পড়ল পালোয়ান ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমাকে জাগতে দেখেই আমার পা চেটে দিয়ে গেল। তার চলার ধরন দেখে বুঝলুম, এখনও দুর্ব্বল। মুংরি আর বদেন কাজে বেরোবার জন্যে তৈরী হচ্ছে।

আমি মুংরিকে বললুম—মুংরি, কুকুরটাকে আমায় দিয়ে দাও, আমি নিয়ে যাই।

মুংরি একটু মুচকি হেসে বললে—কি করে নিয়ে যাবি?

বললুম—কোলে করে।

—অতটা রাস্তা কোলে করে নিয়ে যেতে পারবি?

—পারব।

—তবে যা।

আমি পরম আহ্লাদে লাফিয়ে উঠলুম।

মুখ ধুয়ে পান্তা-ভাত খেয়ে পালোয়ানকে কোলে নিলুম। মুংরি কাটা ল্যাজটা রেখে দিল। ঐ রইল তার স্মৃতি। শুধু বললে—ওকে ভালো করে খাওয়াস্, যাতে জোর পায়।

মুংরি হয়তো ভেবেছিল, আমায় শুধু বাস্-স্টপ অবধি কুকুর কোলে হাঁটতে হবে। কিন্তু হল অন্যরকম। কুকুর নিয়ে বাস্-এ উঠতে দিলে না। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলুম—আর কী উপায় আছে। ট্রেনে করে যাবো? কিন্তু ট্রেনেই কি কুকুর নিতে দেয়? হয়তো নামিয়ে দেবে। নাঃ একমাত্র হাঁটা ছাড়া আর কোনো উপায় দেখছি না। তাই আর না ভেবে, সময় নষ্ট না করে শুরু করলুম হাঁটতে, লম্বা লম্বা পা ফেলে। একটা চৌমাথার মোড়ে যখন এসে পড়েছি, দেখি অন্য লাইনের একটা প্রায় খালি বাস্ আসছে। পালেয়োনটাকে যতটা পারি বগলের তলায় ঢেকে, পাদানিতে পা দিয়ে উঠে পড়লুম বাসের মধ্যে। কিন্তু কুকুর দেখে সঙ্গে সঙ্গে নামিয়ে দিল। বেশী পয়সা দিতে চাইলুম,

নিল না। বুঝলুম আর কোনো রাস্তা নেই। কুকুর কোলে সারা পথ হেঁটেই যেতে হবে। সকালের ঠাণ্ডা বাতাসে হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল না, কিন্তু দেখতে দেখতে রোদ বেড়ে উঠল। তখন কষ্ট হতে লাগল। একে কুকুরের বোঝা, তার উপর তেষ্টা পাচ্ছে। যত চলছি তত ঘামছি। শেষে পা যেন আর বইতে চায় না। এক জায়গায় বসে পড়লুম। জিরোলুম খানিকটা। পালোয়ানের গায়ে হাত বুলিয়ে দিলুম। মুংরি পাতায় মুড়ে ওষুধ দিয়েছিল—তারই খানিকটা আর একবার লেপে দিলুম পালোয়ানের কাটা ল্যাজে। তারপর আবার চলতে শুরু করলুম। কিছু দূর হেঁটে রাস্তার ধারে একটা দোকান পাওয়া গেল। তাদের কাছ থেকে খানিক জল চেয়ে নিয়ে তেষ্টা মেটালুম। মনে হল পালোয়ানেরও হয়তো তেষ্টা পেয়ে থাকবে, খিদেও পেয়েছে হয়তো। আমার নিজের খিদের কথা তখন আমার মাথায়ই আসছে না। সেই দোকানে দুধ বিক্রি করছিল। মাটির ভাঁড়ে করে তাই খানিকটা কিনে কুকুরটাকে খাইয়ে দিলুম—বেশ তৃপ্তি করে খেল। তারপর আবার নামলুম পথে। দুপুর গড়িয়ে গেল। প্রখর সূর্য মাথার উপর। পথের যেন শেষ নেই।

অবশেষে সহরে এসে ঢুকলুম। এখানে রিক্‌শ আছে। রিক্‌শ ভাড়া করে বাড়ি যাওয়া চলত, কুকুর নিতেও ওদের আপত্তি নেই, কিন্তু আমার মনে হল, এতটা পথই যখন এলুম এইটুকুর জন্যে আর কেন? হোক পুরোপুরি অ্যাড্‌ভেঞ্চার। কুকুর কোলে নিয়ে বাড়ি পৌঁছলুম বেলা তিনটেয়। বাবা ফিরলেন চারটেয়। আমি তখন স্নান-টান সেরে আসনে বসে গরম লুচি খাচ্ছি, মা বাতাস করছেন। বাবা ঢুকেই বললেন —এই বুঝি তোর পালোয়ান? পালানো কুকুর?

আমি বললুম—কি করে জানলে?

বাবা গিয়েছিলেন আমার খোঁজে ইস্কুলে। সারারাত বাড়ি ফিরিনি দেখে ধরেই নিয়েছিলেন আমি আবার কোনো নতুন অ্যাড্‌ভেঞ্চারে বেরিয়েছি। তারপর ভাবনা হয়েছিল—কোনো বিপদ-টিপদ হয়নি তো? তারপর ইস্কুলে গিয়ে খোঁজাখুঁজি করে শেষে মালীর কাছ থেকে জেনে এসেছেন গজা, নেপো আর দামুর সমস্ত কীর্তি। কুকুরের নামটাও মালীর কাছ থেকে শোনা।

বাবাকে বললুম—বাবা, এবার থেকে পালোয়ান এখানে থাকবে।

বাবা কিছুই বললেন না, তবে মনে হল অরাজী নন।

আমি বললুম—আমি আর দম্‌দম্‌ অ্যাকাডেমিতে যাবো না। আমায় আবার পুরোনো ইস্কুলে ভর্তি করে দাও বাবা।

বাবা বললেন—বেশ তাই হবে। তবে পূজোর ছুটির তো আর পাঁচ দিন—এ ক'দিন বরং পালোয়ানের শুশ্রূষা কর। তারপর চলো সবাই মিলে ছুটিতে দার্জিলিং-এ বেড়িয়ে আসা যাক।

আমি বললুম—সেই ভালো।

॥ ৮ ॥

সেবার দার্জিলিংয়ের পথে বেজায় ভিড়! কলকাতা শুদ্ধ ঝেঁটিয়ে সবাই চলেছে দার্জিলিংয়ে। পূজোর ছুটির আগে থেকেই দলে দলে লোক পাহাড়ে বেড়াতে চলেছে। অনেক হাঙ্গামা করে বাবা তবে একটা সেকেণ্ড ক্লাস কামরা রিজার্ভ করতে পারলেন। ভিড়ের জন্যে পাঁচখানা স্পেশাল ট্রেন দেওয়া হয়েছিল। আমরা দু-নম্বর স্পেশাল ট্রেনে জায়গা পেলুম।

দার্জিলিং এর আগে কখনও যাইনি। শীতের দেশ। কোট নিয়েছি সঙ্গে। কাঞ্চনজঙ্ঘার ছবি দেখেছি শুধু। তাকে চোখে দেখার উৎসাহে মন ভরে উঠল।

বাবাকে বললুম—আচ্ছা বাবা, কাঞ্চনজঙ্ঘা টপকে ওপারে যাবার কোনো রাস্তা আছে নাকি?

বাবা বললেন—তিব্বতে যাবার?

আমি বললুম—হ্যাঁ তিব্বতে?

বাবা বললেন—সে তো কাঞ্চনজঙ্ঘা টপকে নয়। হিমালয়ের উপর দিয়ে অনেক 'পাস্‌' আছে যা দিয়ে যাত্রীরা, ব্যবসায়ীরা এপারে ওপারে যাওয়া আসা করে। কাঞ্চনজঙ্ঘাকে বোধহয় টপ্‌কানো যায় না! শুনেছি এভারেস্টের চেয়েও শক্ত। এভারেস্ট চূড়োয় তো তবু লোক বার বার ওঠবার চেষ্টা করছে। হয়তো উঠেও পড়বে কোনো দিন। কিন্তু কাঞ্চনজঙ্ঘা আরও অনেক শক্ত। বোধহয় একেবারে অনধিগম্য।

আমি বললুম—বড় হয়ে একবার চেষ্টা করে দেখব নাকি?

বাবা বললেন—দেখিস্।

মা জিনিসপত্র গোছাচ্ছিলেন। মাকে রাজী করালুম যাতে পালোয়ান সঙ্গে যায়।

মা বললেন—থাকুক। অন্তত রাত্রে বাড়িটা পাহারা দেবে।

সন্ধ্যে সাতটার সময় ট্রেন। বাবা সকলকে তাড়া-টাড়া দিয়ে ঘণ্টা-খানেক আগে আমাদের স্টেশানে নিয়ে গিয়ে ফেললেন।

শুনলুম কামরার মধ্যে কুকুর নিতে দেবে না। কুকুরের আলাদা টিকিট কেটে চেন বেঁধে জন্তুদের কামরায় তুলে দিতে হবে।

বাবা শেষে ব্যবস্থা করলেন, গার্ডের কামরায় পালোয়ান থাকবে, রাত্রে এক-আধবার আমরা গিয়ে দেখে বা খাইয়েও আসতে পারি।

পালোয়ানকে তুলে দিয়ে এসে আমরা নিজেদের কামরায় ঢুকে গদির উপর বসে প্ল্যাটফর্ম-এর ভিড় দেখতে লাগলুম। সকলেই বাড়ি থেকে খেয়ে এসেছিলেন, কিন্তু তা আমি করিনি। চলতি ট্রেনে খাবার খেতে আমার ভারি আনন্দ হয়। আমার সমস্ত খাবার বেঁধে-ছেঁদে নিজের সঙ্গে নিয়ে এসেছিলুম, বাসনের ফাঁক দিয়ে সেই গন্ধ একটু একটু করে এসে আমার নাকে ঢুকছিল আর জিভে এসে যাচ্ছিল জল। কেবলই মনে হচ্ছিল, কখন ট্রেনটা ছাড়ে?

গাড়ি ছেড়ে দিতে শুধু প্ল্যাটফর্মটা পেরিয়ে যাওয়ার যা অপেক্ষা। আমি আমার পুঁজিপাটা খুলে বসলুম। বাড়িতে গরম গরম খাবারই মা বেঁধে দিয়েছিলেন। খুলে দেখলুম সমস্তই ঠাণ্ডা জল হয়ে গিয়েছে। তাই মুখে দিয়ে খেতে আমার অমৃতের মতো লাগতে লাগল। মনে হতে থাকল, বাড়িতে ঘরের কোণে বাবু হয়ে বসে যত ভালো খাবারই খাই না কেন, এমন তৃপ্তিটি কখনও পাবে না। রেলের গতির সঙ্গে খাবারের স্বাদ যে কি করে বেড়ে যায় সেইটেই আশ্চর্য।

অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে চলল আমাদের ট্রেন। দু-পাশে খালি জোনাকির মেলা। কতক্ষণ পরে এলো রানাঘাট স্টেশান। রানাঘাট পার হয়ে যাবার পর আমরা যে যার বিছানা পেতে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লুম। আমার কিন্তু ঘুম আর আসে না। জানলা দিয়ে অন্ধকার

আকাশটা এক মুঠো তারা নিয়ে আমাদের ট্রেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটেছে—চোখ চেয়ে এই ছবি দেখছি, চোখ বুজেও তাই। মাঝে মাঝে পাশের লাইন দিয়ে ঝড়ের মতো বেরিয়ে যাচ্ছে এক একটা ট্রেন—শব্দেই তার ধাঁধা লেগে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে জানলা দিয়ে একটা গ্যাসের তীব্র আলো কামরার মধ্যে ঢুকেই মিলিয়ে যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে চাকার আওয়াজে টের পাচ্ছি ট্রেনের গতি মন্থর হয়ে আসছে—একটা স্টেশান এলো। স্টেশানে গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকাটা ভারি বিশ্রী লাগে। গরম হতে থাকে, প্ল্যাটফর্মে খস্ খস্ করে মানুষের হাঁটার শব্দ কানে এসে লাগে, চোখে এসে লাগে প্ল্যাটফর্মের হলদে ফিকে আলো—ভাবি কলকাতাতেই আবার ফিরে এলুম নাকি? কেবলই মনে হয়—চললে বাঁচা যায়। শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করে না, উঠলে আরো খারাপ লাগে।

এই ভাবে চলল আমাদের দার্জিলিং মেল। অনেক রাতে ট্রেন পদ্মা নদী পার হল। সবে একটু ফিকে মতো ঘুম আসছিল—ঘটাং ঘটাং শব্দে লাফিয়ে উঠলুম। এই ব্রীজটা দেখবার আমার ভারি ইচ্ছে ছিল। তাড়াতাড়ি দরজার ধারে গিয়ে দাঁড়ালুম। এত প্রকাণ্ড নদী এর আগে আমি কখনও দেখিনি। একটার পর একটা ব্রীজের স্প্যান্ পার হয়ে যাই, নদী আর শেষ হয় না। আকাশে চাঁদ নেই, কেবল তারার আলোয় জলটা ঝলমল করে, কিন্তু এপার ওপার দেখা যায় না। মাঝে মাঝে চোখে পড়ে নৌকোর আলো। ক্রমে সারা পুলের উপর দিয়ে পদ্মা পার হয়ে গেলুম।

তারপর ঈশ্বরদি স্টেশানে এসে আমাদের গাড়ি থামল। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল গাড়িটা! বাবারা এতক্ষণ পাখার হাওয়ার সঙ্গে বাইরে-কার ফুরফুরে ঠাণ্ডা হাওয়ায় দিব্যি আরামে ঘুম দিচ্ছিলেন। গরমের চোটে তাঁদেরও ঘুম ভেঙে গেল। গাড়ি আর ছাড়ে না দেখে শেষে আমি বিরক্ত হয়ে প্লাটফরমে নামলুম। মনে হল যাই একবার পালোয়ানকে দেখে আসি। গার্ডের গাড়িটা একেবারে পিছনে। অনেকটা যেতে হয়! সেখানে পৌঁছতেই আমাকে দেখতে পেয়ে ঘেউ ঘেউ করে পালোয়ান ডেকে উঠল। আমি গার্ডের গাড়িতে উঠে পালোয়ানের গায়ে হাত বুলিয়ে দিলুম। গার্ডসায়েব বললেন, এইমাত্র

পালোয়ানকে খাবার দেওয়া হয়েছে। খেয়েছে সবই, তবে কুঁই কুঁই করছে মাঝে মাঝে। মনে হয়, চেনা লোকদের খুঁজছে। শুনে আমার পালোয়ানের জন্য দুঃখ হল। মনটাও একটু খারাপ হল। গার্ডসায়েব বললেন—যাও এখন দৌড়ে নিজের কামরায় ফিরে। আমি এবার ট্রেন ছাড়ব।

পিছনে পালোয়ানের ঘেউ ঘেউ আর কেঁউ কেঁউ শুনতে শুনতে হন্ হন্ করে আমি এগিয়ে চললুম। কামরার কাছে যখন পৌঁছে গেছি, দেখি লেমনেড বিক্রি করছে। তেষ্টা পেয়েছিল, ভাবলুম খাই একটা। কিন্তু ঠিক সেইসময় গার্ডের হুইসিল পড়ল। লেমনেড আর খাওয়া হল না। এক লাফে কামরায় উঠে পড়লুম।

গাড়িটা ছাড়তে গরমের হাত থেকে বাঁচা গেল। ঠাণ্ডা মেঠো হাওয়ায় তেষ্টাও কোথায় মিলিয়ে গেল টের পেলুম না। কিন্তু আমার চোখে ঘুম নেই।

আবার একটা স্টেশান। সঙ্গে সঙ্গে গরম। দরজা খুলে প্লাটফর্মে নেমে দাঁড়ালুম। দূরে চোখে পড়ল এক ফিরিওয়ালা এক ঝুড়ি সোডা-লেমনেড মাথার কাছে রেখে শুয়ে রয়েছে। ভাবলুম, যাই চট্ করে একটা লেমনেড খেয়ে আসি। লোকটা ঘুমোচ্ছে। ডেকে তাকে তুললুম। বললুম, দেখি, একটা লেমনেড।

একবার চকিতে আমায় দেখে নিয়ে আবার চোখ বুজে জড়িত গলায় সে বলল—লিমনেড নেহি হায়, সোডাবাটার আছে। আবার ঘুমিয়ে পড়বার আগেই তার কাছ থেকে এক বোতল সোডা-ওয়াটার কিনলুম। ছিপি খুলে সে আমার হাতে বোতলটা তুলে দিলে।

এক ঢোক মাত্র খেয়েছি, এমন সময় পিছন থেকে এসে আমার পায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল একটা কি। সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা ভিজেভিজে কিসের একটা পরশ। দেখি পালোয়ান। গলায় বক্‌লোস পর্যন্ত নেই। কি করে চেন খুলে বক্‌লোস খুলে পালিয়ে এল, আর কি করে ঠিক আমাকেই খুঁজে বার করল অবাক হয়ে ভাবতে লাগলুম। মনে পড়ল আমাদের বাড়িতেও কি এক বিচিত্র উপায়ে এই ভাবে দু-একবার গলা থেকে চেন খুলে ফেলেছিল। তাই হয়তো আবার করেছে। কি করবো

এখন পাঁলোয়ানকে নিয়ে ? গার্ডের গাড়িতে দিয়ে আসব ? না কি আমাদেরই কামরায় নিয়ে আসবো ? কে আর এত রাতে গাড়ি চেক্ করতে আসছে ? কেউ টেরও পাবে না। ভোরবেলা, শিলিগুড়ি পেঁৗছে তখন দেখা যাবে। তারপর মনে হল, গার্ডসায়েব যদি দেখেন, কুকুর নেই—পালিয়েছে, তাহলে তাঁর মহা ভাবনা হবে। তাঁরই দায়িত্বে কুকুর ছিল—হারালে তিনি কি জবাব দেবেন ?

আর ভাববার সময় নেই। পালোয়ানকে টপ্ করে কোলে তুলে নিয়ে গার্ডের কামরার দিকে এগোলুম। খানিকটা গেছি এমন সময় গাড়ি ছাড়ার হুইসিল্। তাই তো, এবার কোন দিকে যাওয়া যায় ? গার্ডের কামরার দিকে না নিজেদের কামরার দিকে ? ভাবতে ভাবতেই গাড়ি দুলে উঠল। যেন মর্চেপড়া চেন ধরে কে টান দিল এইরকম আওয়াজ করে খুব আস্তে আস্তে ট্রেনটা চলতে শুরু করল। তখন আমার মনে পড়ে গেল, চলন্ত ট্রামে উঠতে গেলে ট্রাম যেদিকে চলেছে সেইদিকে মুখ করে দৌড়ে উঠতে হয়—উল্টো দিকে দৌড়ে ওঠায় বিপদ; এই ভেবেই আমি আমাদের কামরার দিকে দৌড়তে শুরু করলুম। আমাদের গাড়িটা যেখানে ছিল সেখানে তো আর নেই—এগিয়ে গেছে। ছুটলুম তাই আরও খানিকটা। কিন্তু বেশ খানিকটা গিয়েও আমাদের গাড়িটাকে চিনতে পারলুম না। সব কামরাতেই আলো নেবানো। সেই চলমান অন্ধকার সব জানালা-দরজা দেখতে দেখতে কেমন যেন আমার চোখে ধাঁধা লেগে গেল। মনে হ'ল আমাদের গাড়ি ছাড়িয়ে অনেকটা এগিয়ে এসেছি। তখনও খুব একটা স্পীড হয়নি ট্রেনের। একটু দাঁড়াই। কামরাটা এলে একটু ছুটে লাফিয়ে উঠে পড়ব।

ছোটার জন্যে যতটা না হোক, উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছিলুম। অন্ধকার ট্রেনের কামরাগুলো একটার পর একটা চোখের সামনে দিয়ে বেরিয়ে যেতে লাগল। যে-কোনো একটায় উঠে পড়লেও যে হয় এটা মাথায় এল না। ট্রেনের স্পীড যখন বেড়ে গেল তখন আর করবার কিছু ছিল না। শাঁ শাঁ করে ট্রেনটা আমার চোখের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল। হাঁদার মতো কুকুর কোলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলুম, ট্রেনের পিছনে

গার্ডের ঘরের আলোটা এঁকে বেঁকে অন্ধকারের মধ্যে ছোট থেকে ক্রমে আরো ছোট হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে।

পকেটে হাত দিয়ে দেখলুম, সামান্য কটা পয়সা, আনি, দুয়ানি। এ দিয়ে ভোরের গাড়িতে যে দার্জিলিং যাবো তা-ও হবে না, বাড়ি ফিরে যাবো তা-ও কুলোবে না। তাই তো, এখন কী করা যায়? ভাবলুম, স্টেশান মাস্টারকে একবার ব্যাপারটা জানানো যাক।

স্টেশান-মাস্টার সবে তাঁর লণ্ঠন নিয়ে ঘরে ঢুকতে যাচ্ছেন, তাঁকে ধরলুম।

—সার, বিপদে পড়েছি।

'সার' শুনে খুশী হলেন মনে হল। বললেন—কি হয়েছে?

কুকুর কোলে দাঁড়িয়ে সমস্ত ব্যাপারটা তাঁকে বলে বোঝালুম।

স্টেশান-মাস্টার সব শুনে গম্ভীর ভাবে বললেন—তুমি যে সত্যি বলছ তার প্রমাণ?

আমি জবাব দিলুম—আপাতত এই কুকুরই আমার প্রধান প্রমাণ। আরো প্রমাণ পরে দিতে পারবো যখন আমার বাবা-মার সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবেন।

আমার চট্‌পট্‌ জবাব শুনে মাস্টারমশায়ের ঠোঁটের কোণে একটু হাসি ফুটে উঠল। বললেন—বেশ বলেছ। আচ্ছা আপাতত ঐ বেঞ্চিটায় বসো।

পালোয়ানকে নিয়ে এক মিটমিটে আলোর তলায় এক বেঞ্চিতে গিয়ে আমি বসলুম। খানিক পরে স্টেশান-মাস্টার এসে বললেন—আধঘণ্টা পরে তিন নম্বর স্পেশাল আসছে। তাইতে তোমায় উঠিয়ে দেব। তোমার বাবাকে পরের স্টেশানে টেলিগ্রাফ করে দিচ্ছি যে তোমায় এখানে পাওয়া গেছে। তোমাকে যেন শিলিগুড়ি স্টেশানে তিন নং স্পেশাল থেকে খুঁজে নেন। তা তো হল, কিন্তু তোমার কুকুরের কী হবে?

আমি বললাম—কেন সার, কুকুর নিয়ে কি হল?

তিনি বললেন—কুকুর নিয়েই তো গোল। ওকে ওঠাই কোথায়? গলায় একটা লোহার চেন পর্যন্ত নেই! আর থাকলেও আবার যে খুলে-টুলে ফেলবে না তাতেই বা বিশ্বাস কি?

আমি বললুম—কিচ্ছু ভাববেন না সার। এখন তো সবাই ঘুমে অচেতন—আপনি যে কামরায় তুলে দেবেন, সেখানে বেঞ্চির তলায় ওকে এমন লুকিয়ে রেখে দেব, কেউ টের পাবে না।

—রাত্রে চেঁচাবে না তো ?

—একদম না।

—বেশ তাহলে তোমার উপর আমি নির্ভর করতে পারি ?

—পারেন সার !

স্টেশান-মাস্টার পা ঠুকতে ঠুকতে চলে গেলেন।

ঠিক আধ ঘণ্টা পরে খটাং খটাং শব্দ করতে করতে তিন নং স্পেশাল এসে দাঁড়াল প্লাটফর্মে। মাস্টারমশাই গার্ডকে বলে একটা অন্ধকার সেকেণ্ড ক্লাস কামরায় টোকা মেরে দরজা খোলালেন। আমি পালোয়ান-কোলে উঠে পড়লুম। যিনি ঘুম চোখে দরজা খুলেছিলেন তিনি কুকুর দেখতে পেলেন বলে মনে হল না। আমি চট্ করে পালোয়ানকে বেঞ্চির তলায় লুকিয়ে একটা গদি-মোড়া বেঞ্চিতে শুয়ে পড়লুম।

দেখলুম, গাড়ির প্রত্যেক বেঞ্চিতেই একজন করে শুয়ে আছেন—সবারই চোখ বোজা। আমারই কেবল ঘুম নেই। চিত হয়ে শুয়ে জানালার মধ্যে দিয়ে তারা-ভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছি !

দেখতে দেখতে অনেকটা রাত কেটে গেল। ঠাণ্ডা ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে। চোখ দুটো ভারি হয়ে আসছে। মনে হচ্ছে এইবার ঘুমের কোলে ঢলে পড়ব। সেই সময় কি একটা স্টেশানে গাড়িটা ঢুকল। ঘুমের ভাবটা কেটে যেতে ভাবলুম, দরজা দিয়ে উঁকি মেরে স্টেশানের ঘড়িটায় দেখবো নাকি রাত কত হল ? উঠতে যাবো, সেই সময় বেঞ্চির তলা থেকে পালোয়ান হঠাৎ গর্ র্ র্ করে উঠল। কী আবার দেখল কুকুরটা ভাবছি, এমন সময় খটাং করে দরজাটা খুলে গেল। দেখলুম জটা-মাথায় এক সাধু হেলতে-দুলতে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছেন। স্টেশান-মাস্টারমশায় যাবার আগে দরজার খিলটা ভিতর থেকে এঁটে দিতে বলে গিয়েছিলেন যাতে বাইরে থেকে কেউ না ঢুকতে পারে। খিলটা আমি নিজের হাতে এঁটে দিয়েছিলুম। এখন দেখছি রেল-কোম্পানীর খিলগুলো একেবারেই বাজে।

সাধুকে উঠে আসতে দেখে আমার ভারি বিরক্ত লাগল। বলে উঠলুম—এখানে জায়গা নেই।

আর সকলে দেখলুম গভীর নিদ্রায় মগ্ন, কেউ কোন সাড়া দিলে না। সাধু কোনো জবাব না দিয়ে দরজার খিলটা বন্ধ করে একটা বেঞ্চিতে একজনের পায়ের কাছে বসে পড়লেন।

আমি ভারি ব্যস্ত হয়ে উঠলুম। চোর-ছ্যাঁচড়রা এইরকম সাধু সেজে ঘুরে বেড়ায় আমি জানি। এখানে এতগুলি ভদ্রলোক রয়েছেন, তাঁদের জিনিস-পত্র রয়েছে, ব্যাটা সাধু কোন ফাঁকে কার জিনিস নিয়ে সরে পড়ে কে জানে? আঃ ভদ্রলোকেরা বেহুঁস হয়ে ঘুমোচ্ছেন! আমি চুপিচুপি পাশের বেঞ্চির ভদ্রলোকটিকে হাত দিয়ে ঠেলতে লাগলুম। তিনি কোন সাড়া দিলেন না।

সাধু আমার দিকে চেয়ে ফিক্ করে হেসে বললেন— জাগবে না!

আমি চমকে উঠলুম। কী বললে? জাগবে না? ব্যাটা মন্তর করল নাকি? নাঃ, কিছুতেই নয়, ভদ্রলোককে জাগাতেই হবে। জোরসে এক ঠেলা মারলুম। ভদ্রলোক অস্ফুট ভাবে একবার উঁ করে আবার যেমন-কে তেমন হয়ে গেলেন। সাধুর দিকে ভয়ে ভয়ে তাকালুম—সে তখনও সেই রকম ফিক্ ফিক্ করে হাসছে।

তখন আমার ভয় হতে লাগল, সাধু হয়তো আমার মনের কথা সব টের পেয়েছেন। এতক্ষণ যে এঁকে চোর বলে ভাবছিলুম, জানতে পেরেছেন হয়তো। যাই হোক সাধু ও সম্বন্ধে কিছু বললেন না। খানিক পরে বললেন—বুঝতে পারছি, তোমার একটা খুব কৌতূহল হচ্ছে আমার সম্বন্ধে। বলি তাহলে।

বলে আমার দিকে খানিকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। সে এক অদ্ভুত দৃষ্টি। যেন একখানা ইস্পাতের প্রকাণ্ড লম্বা স্ক্রু তাঁর চোখ থেকে বেরিয়ে এসে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে আমার মধ্যে ঢুকছে। মনে হল, আমার আর কিছু করবার নেই। একেই কি সম্মোহন বলে নাকি? আমিও কি বাকি সবার মতো অজ্ঞান হয়ে ঘুমিয়ে পড়ব?

সেই ভাবে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সাধু বললেন—দেখছিলুম তোমার ভিতরটা খাঁটি কিনা। নাঃ এখনও তুমি নষ্ট হওনি দেখছি—

খাঁটিই আছ। মানুষ ঠকানো আর মিথ্যে কথা বলা এখনও অভ্যেস হয়নি। এই ভাবেই থাকতে চেষ্টা কোরো। দেখবে আখেরে লাভ। যাই হোক, কোথায় যাচ্ছ এখন বল তো।

আমি বললুম—শিলিগুড়ি হয়ে দার্জিলিং।

সাধু বললেন—তা একা কেন? এঁরা তো তোমার কেউ নন দেখছি।

আমি বললুম—বাবা-মার সঙ্গে যাচ্ছিলুম, একটা স্টেশানে জল খেতে নেমেছিলুম, এমন সময় ট্রেন ছেড়ে দিল। তার পরের ট্রেনে যাচ্ছি। বেশ অ্যাড্ভেঞ্চার হচ্ছে।

সাধু বললেন—অ্যাড্ভেঞ্চার তোমার একটা বাতিক, তাই না?

আমি বললুম—অ্যাড্ভেঞ্চার আমার চমৎকার লাগে। তবে এখনও তেমন তেমন অ্যাভ্ভেঞ্চার আমার জীবনে ঘটেনি।

সাধু গম্ভীর ভাবে বললেন—ঘটবে। ঘটিয়ে দেব।

আমি বললুম—আপনি ঘটিয়ে দেবেন?

সে কথার কোনো উত্তর না দিয়ে সাধু বললেন—শোনো তাহলে, এই ট্রেনে কেন আমি উঠেছি। আমায় যেতে হবে এক জায়গায় খুব তাড়াতাড়ি, এই কারণ। দরজায় একটা খিল দেওয়া ছিল—ওটা আমি ইচ্ছাশক্তির বলে খুলে ঢুকেছি। আর ট্রেনটা বড় আস্তে যাচ্ছে। আমার দরকার খুব তাড়াতাড়ি এক জায়গায় পৌছনো। ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে ট্রেনের গতি প্রায় চারগুণ বেড়ে গেল, লক্ষ্য করেছ? বিশ্বাস হচ্ছে না? একবার উঁকি মেরে দেখ তো।

আমি তাঁর কথা শুনেই বুঝতে পেরেছি রেলের লাইনের চাকার শব্দ দ্রুততর হয়ে উঠেছে। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আমার মুখে আর কথা সরল না। এত জোর ট্রেন ছুটে চলেছে যে বাতাস এসে ছুরির মতো লাগছে।

সাধু বলে চললেন—আপাতত গাড়িটাকে শিলিগুড়ির লাইন থেকে ঘুরিয়ে একটা ব্রাঞ্চ-লাইনে নিয়ে যাবো। এতে আমার শর্ট্কাট হবে। বতুঙ্গ পাহাড়ের নাম শুনেছ?

আমি বললুম—না।

সাধু বললেন—সত্যিই তো, তুমি কোত্থেকে শুনবে? সে যাই হোক, সেই বতুঙ্গ পাহাড়ের চূড়োয় সকালের মধ্যে আমায় পৌঁছতে হবে। পাহাড়টা চার হাজার ফিটের বেশী উঁচু নয়, কিন্তু চারিদিকেই দেয়ালের মতো খাড়া পাথরের বেড়া। তা এত খাড়াই আর এত পিছল যে কোনো মানুষই তাতে উঠতে পারে না। এরই মধ্যে এক গোপন পথ আছে—সে কথা আমার জানা। সেই পথেই আমি উঠব। আশা করছি সূর্য ওঠবার আগেই চূড়োয় পৌঁছতে পারব। এমন অপূর্ব পাহাড় পৃথিবীতে আর দুটি নেই—অথচ মানুষ এর খবর রাখে না। পাহাড়ের চূড়োয় কী আছে কোনো মানুষ জানে না। কিন্তু আমি দেখেছি। সে যেন দেবতার এক উপবন! সেইখানে বসে সাধন করে আমি এত ইচ্ছাশক্তির অধিকারী হয়েছি। অন্য কোথাও হলে হত না। চূড়োয় পৌঁছবার কিছু আগে থেকেই দেখতে পাবে পাহাড় ঘিরে চারিদিক থেকে ঠাণ্ডা জলের ফোয়ারা উঠছে, তার তলায় লাখে লাখে পাখি আর এত রঙিন পাথরের নুড়ি—কোনগুলো পাখি, কোনগুলো নুড়ি তুমি ধরতেই পারবে না। চূড়োয় পৌঁছে দেখবে ফুলের রাজ্য—সেখানে সারা বছর ফুল ফোটে। চূড়োটা একটা প্রকাণ্ড ঢালু মাঠের মতো—সেখানে ফুলের বন ছাড়া আর কিছু নেই। ফুলবনের মধ্যে দিয়ে রঙিন নুড়ি ফেলা রাস্তা আছে—পাথরের নুড়ির যে এমন রং হয় তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। দেখে মনে হবে মানুষের তৈরী রাস্তা, কিন্তু আসলে সরু সরু জলের স্রোতে নুড়ি জমে জমে এই রাস্তা তৈরী হয়েছে। আমি একটা রাস্তার নাম দিয়েছি—ফিরোজায়ন! ফিরোজা রংএর নুড়িতে এই রাস্তা তৈরী হয়েছে। ফিরোজায়ন ধরে কিছু দূর নীচের দিকে নেমে গেলেই প্রকাণ্ড একটা হ্রদ। এই হ্রদের ধারে বসে আমি সাধনা করি। সেইখানে আমায় যেতে হবে তাই তাড়াতাড়ি এই ট্রেনে উঠে পড়েছি।

আমি বললুম—কোন স্টেশানে আপনি নামবেন?

—রাহাকোট। তোমাদের এই ট্রেনটাকে তো আমি এখন ব্রাঞ্চ-লাইন দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি, এই ব্রাঞ্চ-লাইনেই রাহাকোট স্টেশান—ঠিক বতুঙ্গ পাহাড়ের নীচে। সেখানে নেমে তোমাদের ট্রেন ছেড়ে দেব—ঠিক সময় তোমরা শিলিগুড়িতে গিয়ে পৌঁছবে।

আমি বললুম—আমাদের ইঞ্জিনের ড্রাইভাররা টের পাচ্ছে না, এই ভুল লাইন দিয়ে এত জোরে চলেছে গাড়ি ?

—কী করে টের পাবে ? সব তো ঘুমোচ্ছে—একেবারে অজ্ঞান।

—ঘুম থেকে জাগলে টের পাবে ?

—মোটেই না! বুঝতেই পারবে না। ভাববে যেমন চলছিল তেমনই চলছে।

আমি বললুম—সাধুজী! বতুঙ্গ পাহাড়টা দেখবার আমার ভারি ইচ্ছে করছে। আমাকে সঙ্গে নেবেন ?

সাধু বললেন—ও বাবা, সে ভয়ানক শক্ত। সাধারণ মানুষ তো উঠতেই পারে না। একমাত্র যাদের খুব অ্যাড্‌ভেঞ্চার করা অভ্যাস তারাই পারতে পারে।

আমি ব্যগ্র হয়ে বললুম—আমার অ্যাড্‌ভেঞ্চার করার খুবই অভ্যাস আছে সাধুজী, আপনাকে তো বলেছিলুম। আমি ঠিক পারব। যেমন করে পারি উঠব—আমায় সঙ্গে নিন।

সাধু বললেন—বেশ তবে তৈরী থেকো। বিপদ-আপদ হলে কিন্তু তোমার দায়।

আমি বললুম—হ্যাঁ সাধুজী, সে আমার দায়। আপনি তার জন্যে কিছু ভাববেন না।

আর বিশেষ কিছু হল না। অনেক রাত হয়েছে তখন। বেশ ঘুম পেয়ে আসতে লাগল। কিন্তু আমি প্রাণপণে বসে রইলুম। একবার ঢুলুনি এসে গেছে, হঠাৎ টের পেলুম, এক স্টেশানে এসে গাড়ি ঢুকছে, সাধু কমণ্ডলু হাতে উঠে দাঁড়াচ্ছেন। রাহাকোট স্টেশান।

আমরা দুজনে নেমে পড়লুম।

টিনের ছাউনি দেওয়া স্টেশান। একটা প্ল্যাট্‌ফরম পর্যন্ত নেই। আমরা নামতেই ট্রেনটা চলতে আরম্ভ করল, গার্ডের হুইসিলের জন্য অপেক্ষা না করেই। গার্ড, ড্রাইভার, প্যাসেঞ্জার সবাই মনে হল ঘর অন্ধকার করে ঘুমোচ্ছে। মনে হয় সাধুর ইচ্ছাশক্তিতেই ট্রেনটা চলে যাচ্ছে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল পালোয়ান রয়ে গেছে কামরার মধ্যে। আমি ছুটতে যাচ্ছিলুম, সাধুজী আমার হাত ধরলেন। বললেন—

দুর্গম পাহাড়ে নিজেদেরই ঝুলে ঝুলে উঠতে হবে—কুকুর নেওয়া যাবে না।

আমি বললুম—এ কুকুরটা বড় চালাক ছিল সাধুজী। নিজেই উঠত পাহাড়ে।

সাধু বললেন—তর্ক কোর না। এখন চল।

আমি বললুম—কুকুরটা ঠিক মতো শিলিগুড়িতে পৌঁছবে তো?

সাধু বললেন—কোনো চিন্তা করো না।

আমি বললুম—কুকুরটাকেও আপনি ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিলেন বুঝি? আমরা নামবার সময় একটি শব্দও করল না।

সাধুজী কোন কথা না বলে আমার হাত ধরে টানতে টানতে মাঠের মধ্যে গিয়ে পড়লেন। সামনে একটা প্রকাণ্ড কালো দৈত্যের মতো বতুঙ্গ পাহাড়টা চোখে পড়ল। মেঠো আঁকা-বাঁকা পথ ধরে আমরা চললুম। মনে হল সাধুজী আমার হাত ধরে উড়িয়ে নিয়ে চলেছেন। টপাটপ্ ক্ষেতের পর ক্ষেত আমরা পার হতে লাগলুম। লাফাতে লাফাতে আমরা চলেছি—যেন বাতাসের আগে যাচ্ছি।

এমনি করে বতুঙ্গ পাহাড়ের তলায় এসে দাঁড়ালুম। পাহাড়ের তলাটা ঘোরতর অন্ধকার—ঠিক যেন কালো বাতাস জমাট বেঁধে রয়েছে। সাধুজী একটা গাছের ডাল ভেঙে মশাল জ্বাললেন। তাইতে খানিকটা আলো হল। দেখলুম পাহাড়ের গা-টা ঝোপে ভরা—তার মাঝ দিয়ে কোনো রাস্তা চোখে পড়ে না। খাড়া খাড়া পাথরের গা দিয়ে লম্বা লম্বা সাপের মতো একরকম লতা ঝুলছে। সেই লতা কয়েকটা উপড়ে টেনে টেনে তাদের জোর পরীক্ষা করে সাধুজী একটা নিজের কোমরে, একটা আমার কোমরে বাঁধলেন। বললেন—কাজে আসবে। তারপর আমাদের পাহাড়ে ওঠা শুরু হল। অসম্ভব খাড়াই পাহাড়—তাতে ওঠে কার সাধ্য। সাধু একটি সুঁড়ি পথ বার করেছেন। আমি একটা গাছের ডাল ভেঙে লাঠি করে নিয়েছি। অন্ধকারের মধ্যে এই লাঠিটাই আমার সম্বল। নইলে একবার পা পিছলে গেলে কোথায় যে তলিয়ে যাবো হয়তো আর খুঁজেই পাওয়া যাবে না।

কিন্তু খানিক দূর উঠে সেই সুঁড়ি রাস্তা ফুরিয়ে গেল। মাথার

উপর দেখলুম বড় বড় ঝুলন্ত পাথরের চাংড়া গায়ে গায়ে লেগে আটকে রয়েছে। রাস্তা একেবারেই ফুরিয়েছে।

আমি ভাবলুম—বাস্, এত কষ্ট করে আসা বুঝি বৃথা হল।

সাধুজী বললেন—এই সব পাথরের মাঝ দিয়ে আঁকা-বাঁকা একটা সরু ফাটল উপর দিকে উঠে গেছে। কিন্তু শুকনো শেওলা জমে প্রায় সে ফাটল বুজে যায়। খুঁজে পাওয়াও শক্ত। আমি জানি—এসো!

বলে আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে চললেন খানিকটা!

আমি বললুম—কিন্তু কি উপায়ে সে-পথ পরিষ্কার করবেন?

সাধুজী জ্বলন্ত মশালটা নিয়ে একটা জোড়ের মুখে ধরলেন। ধরতেই দাউ দাউ করে সে জায়গাটা ধরে উঠল। আমরা একটু সরে গিয়ে দাঁড়ালুম। দেখতে দেখতে সমস্ত ফাটলটা পরিষ্কার হয়ে গেল। জায়গাটাকে একটু ঠাণ্ডা হতে দিয়ে সাধুজী ফাটলের মুখে দাঁড়িয়ে লতার ফাঁস ছুঁড়তে লাগলেন। কয়েকবার ছুঁড়তেই সেটা উপরের একটা মুড়ো গাছের গুঁড়িতে আটকাল। তাই ধরে আমরা ফাটলের গায়ে পা রেখে প্রায় ঝুলতে ঝুলতে উপরে উঠে এলুম।

এইবার আরম্ভ হল খাড়া-খাড়া উঁচু-উঁচু ছুঁচোলো পাথরের শ্রেণী। এখানে পায়ে হেঁটে প্রায় ওঠাই যায় না। প্রায় সারা পথই লতার ফাঁস ফেলে ঝুলতে ঝুলতে উঠতে হয়। এমনি ভাবে উঠছি তো উঠছিই—অনেক পথ উঠলুম।

আমি ক্লান্ত হয়ে পড়ছি; সাধুর কিন্তু উৎসাহের অন্ত নেই। তিনি খালি বলে চলেছেন—চল চল, এগিয়ে চল।

এদিকে আমার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। কোথায় যেন একটা ঝরণার ঝর-ঝর শব্দ শুনতে পেলুম। শুনে তেষ্টা আরো বেড়ে উঠল। বললুম—সাধুজী, একটা ঝরণার শব্দ পাচ্ছি। এক ঢোক জল খেতে পারলে আরাম পেতুম। দেখবো নাকি একবার ওদিকে?

সাধু বললেন—এইটুকু উঠেই তেষ্টা পেয়ে গেল? আর ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই তো ফোয়ারার কাছে পেঁ ছিব। সে ফোয়ারার জল দেখবে কেমন মিষ্টি কেমন শীতল।

আমি বললুম—সে দেখবো এখন। আপাতত এখানকার জল খেয়ে এক ঘণ্টার মতো প্রাণটা বাঁচাই।

সাধু বললেন—ওদিককার পাথরগুলো নড়বড়ে—একটু সাবধানে যেও। যাও, কাছেই ঝরণা পাবে।

আমি এগোলুম লাঠি ধরে ঠুক ঠুক করতে করতে। কিছু দূর গিয়েই পেলুম ঝরণাটা। প্রকাণ্ড একটা ঢালু পাথর—তার মাথাটা নেড়া। একধারে ঢালু হয়ে সেটা ঝরণার জলে মিশেছে। যেখানে মিশেছে সেখানে গোটা দুই-তিন মাঝারি গোছের গাছ। পিছল বলে মনে হল পাথরটাকে, তারপর পায়ের চাপে কেমন যেন টলমল করছে। সাধু বলেছিলেন সাবধানে যেতে, তাই অতি সন্তর্পণে এগোতে লাগলুম।

ঝরণার জলে হাত দিয়ে দেখলুম ভারি ঠাণ্ডা, ভারি ক্লান্তিহরা। এক আঁজলা জল দিয়ে প্রথমে মুখটা ধুয়ে ফেললুম ; কপালে দিলুম খানিকটা, তারপর তেষ্টা মেটালুম। মনে হল এবার বেশ জোর-কদমে হাঁটতে পারব।

কিন্তু উঠে দাঁড়িয়েই মনে হল, পায়ের তলায় পাথরটা যেন বড় বেশী টলছে। মনে হয় ধীরে ধীরে সরেও যাচ্ছে। আমি ভাবছি সাবধানে এ-পাথরটা পার হয়ে অন্য একটা পাথরে উঠব, সেই সময় বেশ টের পেলুম পৃথিবীর মাটিতে ছোট-খাট একটা ভূমিকম্প হচ্ছে—কারণ দেখলুম গাছগুলো শিউরে শিউরে উঠছে। পাথরে যেন আর দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। একে পিছল, তার উপর কাঁপছে, টলছে। আমি কোনো রকমে একটা গাছের কাছে গিয়ে গুঁড়িটা জাপটে ধরলুম। সঙ্গে সঙ্গে অত বড় পাথরটা আস্তে আস্তে গড়াতে আরম্ভ করল। ঝরণাটাকে চাপা দিয়ে পাথরটা নীচের দিকে নেমে যেতে লাগল। দেখলুম তার তলাটা হাঁ হয়ে যাচ্ছে। গাছটা হেলে পড়ল। আমি কিন্তু গাছ ছাড়লুম না। চারিদিকে তখন কাঁপুনি শুরু হয়েছে। আমি আমার কোমরে জড়ানো লতা দিয়ে গাছের গুঁড়ির সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেললুম। তারপর কি হল ঠিক জানি না। মনে হল আশেপাশের পাথর, মাটি, ক'টা গাছ আর সেই সঙ্গে আমি, সবাই মিলে নীচে গড়িয়ে নেমে চলেছি।

এ-পতনের যে কি পরিণাম, ভেবে ভয়ে আমি চোখ বুজে ফেললুম। চারিদিকে হুড়মুড় পাথরের শব্দ। উপরে তাকিয়ে দেখলুম ফুটবলের মতো লাফাতে লাফাতে গড়িয়ে আসছে ছোট-বড় পাথরের চাঁই। এর একটা লাগলে পিষে গিয়ে আমি চিঁড়ে-চ্যাপটা হয়ে যাবো। গাছটার সঙ্গে বাঁধা না থাকলে আমিও হয়তো ঐ রকম ফুটবলের মতো লাফাতে লাফাতে কোথায় ছিটকে যেতুম।

আমার গাছটা আমাকে নিয়ে আর সেই সঙ্গে হয়তো মস্ত এক চাংড়া মাটি নিয়ে পিছলে পিছলে নীচে নেমে চলেছে। সাধুজী পিছনে পড়ে রইলেন। তিনি আমার এই বিপদের কথা জানলেন কি না, তাও জানবার কোনো উপায় নেই।

এই ভাবে গড়াতে গড়াতে এক জায়গায় এসে হঠাৎ একটা বিষম ঝটকায় গাছসুদ্ধ আমি ছিটকে পড়লুম। সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথায় লাগল একটা চোট। কিসের চোট—উড়ন্ত পাথরের না মাটিতে পড়ার ফল বোঝবার আগেই আমি অজ্ঞান হয়ে গেলুম।

যখন জ্ঞান হল দেখলুম, অন্ধকার মাঠের মধ্যে পড়ে রয়েছি। যে গাছটায় নিজেকে বেঁধেছিলুম বা যে লতা দিয়ে বেঁধেছিলুম, আশে-পাশে কোথাও তাদের কোনো চিহ্ন নেই। বতুঙ্গ পাহাড়টা দূরে ধোঁয়ার মতো দেখা যাচ্ছে। মনে হয় কে যেন পাহাড়ের তলা থেকে আমায় কুড়িয়ে, লতা-বন্ধন থেকে মুক্ত করে, এখানে রেখে গেছে। মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে কোথাও চোট লাগার কোনো চিহ্ন খুঁজে পেলুম না।

তবে কি সাধুজীই আমায় এইভাবে মায়াবলে উদ্ধার করে রেখে গেলেন? কে জানে!

চেঁচিয়ে ডাকলুম—সাধুজী! সাধুজী!

কিন্তু কোনো সাড়া এল না।

পাহাড়ের দিকে পিছন ফিরে উঠে দাঁড়ালুম। দেখলুম, কিছু দূরে একটা সবুজ আলো জ্বলছে।

সবুজ আলোটা লক্ষ্য করে চলতে লাগলুম। একটু এগিয়ে বুঝলুম, ওটা একটা রেলের সিগন্যালের আলো। রেলের সিগন্যাল যখন আছে

তাহলে কাছেই স্টেশানও আছে। রেলের লাইন ধরে খানিকটা চলতেই কিছু দূরে গিয়ে স্টেশান পড়ল—সেই রাহাকোট স্টেশান!

একজন কুলিকে জিজ্ঞেস করলুম—সিগন্যাল দিয়েছে, কোন গাড়ি আসছে?

সে বললে—দার্জিলিং মেল, চার নম্বর স্পেশাল।

আমি স্থির করলুম, যে কোনো একটা কামরার দরজা খোলা পাবো, উঠে পড়ব। রাত্রে কে আর চেক্ করবে? স্টেশান মাস্টারকে জানাতে গেলে উল্টো বিপত্তি হতে পারে।—টিকিট কই? কার ছেলে? তিন নম্বর স্পেশাল থেকে আবার নামলে কেন? কোথায় গিয়েছিলে? এই সব হাজার প্রশ্ন? তাদের যথাযথ জবাবও দেওয়া যাবে না। এই সব ভাবতে ভাবতে ট্রেনটা এসে পড়ল।

একটা অন্ধকার সেকেণ্ড ক্লাস দরজার কামরা ঠেলতেই খুলে গেল। আমি নিঃশব্দে উঠে পড়লুম।

উঠেই মনে হল, আরে রাহাকোট স্টেশান তো ব্রাঞ্চ লাইনে। সাধুর ইচ্ছাশক্তিতে তিন নং স্পেশাল ব্রাঞ্চ লাইনে যেতে পারে, কিন্তু চার নং শেস্পাল যাবে কেন? এর পিছনেও কি সাধুর কোনো উদ্দেশ্য?

আমি ততক্ষণে একটা গদি মোড়া বেঞ্চিতে টান হয়ে শুয়ে পড়েছি। ক্লান্তিতে শরীর অবসন্ন। আর ভাবা যায় না। রাহাকোট, ব্রাঞ্চ লাইন, বতুঙ্গ পাহাড়, সাধুজী, এই কটা শব্দ মাথার মধ্যে একবার ঘুরপাক খেয়ে গেল। তার পরের মুহূর্তেই আমি ঘুমিয়ে পড়লুম। ঘুম ভাঙলো ভোরবেলা শিলিগুড়ি স্টেশানে।

ঘুম ভেঙে দেখি, চার-পাঁচজন ভদ্রলোক গাড়ির মধ্যে উঠে খুব আস্ফালন করছেন। তাঁদের মধ্যে একজন বলছেন—কি আশ্চর্য! দেখুন ব্যাটা কারুর জিনিসপত্র নিয়ে গেল কি না!

কি ব্যাপার কিছুই বুঝলুম না। লাফিয়ে উঠে জিজ্ঞেস করলুম—কি হয়েছে কি?

তাঁরা বললেন—একজন সন্ন্যাসী না কে কামরার মধ্যে বসে ছিল। কেউ তাকে দেখতে পায়নি। এই-মাত্র চোখে পড়ল সে নেমে চলে যাচ্ছে। ব্যাটা চোর কি বাটপাড় তার বিশ্বাস কি?

—কোথায় সন্ন্যাসী ? বলে আমি জানালা দিয়ে মুখ বাড়ালুম।

একজন দেখিয়ে দিলেন, প্ল্যাটফরম পার হয়ে এক জটাওয়ালা সন্ন্যাসী চলে যাচ্ছে।

তাই তো! এ তো কালকেরই সাধুজী! আমি বললুম—এঁকে আমি অনেক রাতে আমাদের কামরায় উঠতে দেখেছি। ভিতর থেকে খিল বন্ধ ছিল, কেমন করে খুলল জানি না।

সেই সময় হঠাৎ বেঞ্চির তলা থেকে কে আমার পা চেটে দিল। নীচু হয়ে দেখলুম পালোয়ান।

তাই তো পালোয়ান এ-ট্রেনে কি করে এলো ? আমতা আমতা করে আমি বললুম—এটা কি চার নম্বর স্পেশাল ?

—চার নম্বব কেন হবে, তিন নম্বর। তা তুমি দেখেছিলে যদি আমাদের বলনি কেন ? আমরা ব্যাটার ঘাড় ধরে নামিয়ে দিতুম।

তখন ভদ্রলোকদের চিনতে পারলুম। এঁদেরই ঘরে স্টেশান-মাস্টার কাল আমায় তুলে দিয়ে গেছেন।

আমি বললুম—বলতে যাচ্ছিলুম। আপনারা বেহুঁস হয়ে ঘুমোচ্ছিলেন। তারপর কি রকম সব গোলমাল হয়ে গেল। সাধু বোধহয় মন্তর করেছিল।

ভাবলুম, এ সাধু অলৌকিক শক্তির অধিকারী। একে আব একবার ধরতেই হবে। ভেবে পালোয়ানকে ডেকে নিয়ে এক লাফে কামরা থেকে নেমে পড়লুম।

নেমে পড়তেই সামনে দেখি বাবা।

বাবা ধমক দিয়ে বললেন—তখন থেকে সারা গাড়ি খুঁজছি, কোথায় ছেলে ? কোথায় ছেলে ? টেলিগ্রাম পেয়ে অবধি তোমার মা ভাবছেন—আর আমরা তো জানতুমই না আমাদের কামরায় তুমি নেই। আমরা খুঁজছি, আর এখানেই বসে বসে বাবু গল্প করছেন। চলো শিগ্‌গীর!

উঁকি মেরে প্ল্যাটফরমের কোথাও সাধুর কোন চিহ্নই দেখতে পেলুম না।

বাবা মায়ের কাছে নিয়ে গেলেন। তারপর আমরা দার্জিলিং-হিমালয়ন রেলে চেপে বসলুম।

বাবার কাছ থেকে টাইম-টেব্‌ল্‌টা চেয়ে নিয়ে দেখলুম, রাহাকোট বলে কোনো স্টেশানই নেই, না মেন লাইনে, না কোনো ব্রাঞ্চ লাইনে।

তা থাকবে কেন? ই-বি-আর লাইনে বাংলা দেশে যদি রাহাকোট থাকবে তাহলে তো সবাই সেখানে ভিড় করবে। এ হল কোথাকার কোন এক অচেনা জায়গা—যেখানে আছে নির্জন রেলের লাইনের ধারে শান্ত রাহাকোট আর তার গায়ে রহস্যভরা বতুঙ্গ পর্বত—যেখানে আমি গিয়েছিলুম, সন্ন্যাসী আমায় নিয়ে গিয়েছিলেন—যেখানে এত বড় একটা অ্যাড্‌ভেঞ্চার করে এলুম আমি, যার কথা বাবা-ও জানেন না, মা-ও জানেন না।

আর সব মিথ্যে হতে পারে, স্বপ্ন হতে পারে—অ্যাড্‌ভেঞ্চার তো আর মিথ্যে নয়।

॥ পরিশিষ্ট ॥

বাবুইয়ের সঙ্গে যখন আমার প্রথম পরিচয় তখন বাবুইয়ের বয়েস পনেরো, আমার চব্বিশ। তখনও ভারতে ইংরেজ রাজত্ব চলেছে পুরোদমে; ভাবতেই পারতুম না যে আমাদেরই চোখের সামনে তার অবসান হবে। তখনও বাংলা দেশ ভাগ হয়নি। রাত আটটায় শেয়ালদা স্টেশান থেকে দার্জিলিং মেল ছাড়তো—পূর্ব বঙ্গের মধ্যে দিয়ে গম্‌গম্‌ করতে করতে সকাল সাতটায় পৌঁছে যেত শিলিগুড়ি। তখনও এভারেস্টের চুড়োয় মানুষ ওঠেনি। এভারেস্ট-বিজয় এক অসম্ভব স্বপ্নের মত মনে হত। সেই যুগে বাবুই যখন কিশোর তখন তার মাথায় যে-সব অ্যাড্‌ভেঞ্চারের পরিকল্পনা আসতো আর তাকে কার্যে পরিণত করত কিংবা হঠাৎ কোনো অ্যাড্‌ভেঞ্চারের মধ্যে পড়ে গিয়ে বীর-রূপে বার হয়ে আসত তার অনেক গল্প বাবুইয়ের মুখ থেকে আমি শুনেছিলুম, যার কিছু কিছু এই বইতে লিপিবদ্ধ করেছি।

বাবুইয়ের অ্যাড্‌ভেঞ্চার কিন্তু এখানেই শেষ হয়নি। কৈশোর থেকে যৌবনের পথে এবং যৌবনের পরে তার সমস্ত জীবনটাই এক অ্যাড্‌ভেঞ্চার। যে অ্যাড্‌ভেঞ্চারের স্রোতে পড়ে মানুষ জীবনের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায় এ হচ্ছে সেই রকম। বাবুই বাঁচার মতো বেঁচেছে! বাঁচা যাকে বলে।

এখনও বাবুইয়ের সঙ্গে আমার দেখা হয়। তার মনটি এখনও সেই কৈশোরের যুগে আটকা পড়ে আছে। দেহ তার বুড়িয়ে এসেছে, কিন্তু মন আগেরই মত সবুজ, জাগ্রত, গ্রহণক্ষম। মনের দিক থেকে কোনোদিন সে বুড়ো হবে না।

বাবুই বি-এ পাস করবার পর তার বাবা হঠাৎ মারা যান তাঁর নিজেরই কারখানার ঘুরন্ত বেল্‌টিংয়ে কাপড় জড়িয়ে গিয়ে। বাবুইদের অবস্থা বেশ ভালই ছিল, ব্যবসা থেকে রোজগারও হত প্রচুর। কাকা ছিলেন ব্যবসার অংশীদার। কিন্তু বাবা মারা যাবার পর বাবুই আবিষ্কার

করল যে কারখানার শুরুতে কাকা আর বাবা সমান অংশীদার ছিলেন বটে কিন্তু এত বছর পরে দাঁড়িয়েছে এই যে কাকাই এখন ব্যবসার সম্পূর্ণ মালিক, বাবার আর কোনো অধিকার নেই। বাবুইয়ের বাবা এক সময় মুক্তোর ব্যবসা করবেন বলে কিছু টাকা নিজেদের কারখানা থেকে ধার নিয়েছিলেন। কাকা বারণ করেছিলেন এমন একটা অজানা ব্যবসার ঝুঁকি নিতে। কিন্তু বাবা শোনেননি—অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর লাভের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু যে বিদেশীটি তাঁকে কাল্‌চার্ড মুক্তোর বদলে ঝুটো মুক্তো দিয়ে ঠকিয়ে গা ঢাকা দিয়েছিল তাকে আর তিনি ধরতে পারেননি! প্রচুর দেনা শুধতে গিয়ে তাঁর কারখানার সমস্ত অংশটাই বেচে দিতে হয়েছিল কাকার কাছে। সমস্ত ব্যাপারটা কাকা আর বাবা গোপন রেখে এসেছেন সবার কাছ থেকে। বাবা-কাকার যৌথ সংসার যেমন চলে আসছিল তেমনিই চলে আসছিল বরাবর। বাবা কারখানায় বেরতেন। তার জন্যে কাকা তাঁর সব রকম খরচ স্বচ্ছলভাবে মিটিয়ে এসেছেন বরাবর, বরং উত্তরোত্তর স্বচ্ছলতা বাড়িয়েই দিয়েছেন; একটুও কার্পণ্য করেননি। তাই এতদিন কেউ টেরও পায়নি যে কয়েক বছর আগে এত বড় একটা চিড় খেয়ে গিয়েছিল বড় ভাইয়ের জীবনে।

বংশুবাবু মারা যেতে ব্যাপারটা আর গোপন রইল না। কিন্তু কাকা বললেন—বাবুই আমার কাছেই মানুষ হবে। বাবুইকে আমি বিলেতে পাঠাবো ব্যারিস্টারি পড়বার জন্যে। তারপর ও নিজের পায়ে দাঁড়াক। আর বৌঠান যদি চান বিলেত যাবার আগে বাবুই বিয়ে করে যাবে তাতেও আমার আপত্তি নেই। তাহলে মেয়ে দেখা হোক।

বংশুবাবু মারা যাবার পর এক বছর কেটে গেল। বাবুইয়ের মা মেয়ে দেখতে শুরু করেছেন আর কাকা আয়োজন করছেন তাকে বিলেত পাঠাবার সেই সময় হঠাৎ একদিন বাবুই নিখোঁজ হল। কিশোর বাবুই যখন নিখোঁজ হত তখন বাপ-মায়ের অত ভাবনা হত না। তাঁরা জানতেন খেয়ালি ছেলে দু-একদিনের মধ্যে ফিরে আসবে। কিন্তু এবারকার নিখোঁজটা সকলেই মনে মনে বুঝলেন একটু অন্যরকম। মায়ের ক-দিন খুব উদ্বেগে কাটল, তারপর বোম্বাই থেকে চিঠি এল;

বাবুই লিখেছে সে নাকি খালাসির ছদ্মনামে কোনো এক মালবাহী জাহাজে ইয়োরোপ যাত্রা করেছে। জাহাজের নাম দেওয়া বারণ। তার সম্বন্ধে ভাবনা করতে বারণ করেছে ; সে নিজেই সময় মত খবর পাঠাবে লিখেছে।

কিন্তু বহুদিন খবর এল না। তার কারণ ছিল। বাবুই উঠেছিল লণ্ডনের ঈষ্ট এণ্ড-এ। সেটা লণ্ডনের গরীব আস্তানা—বস্তি। জাহাজী কুলির কাজ করত। দারিদ্র্য এবং দুর্দশার মধ্যে দিন কাটত। সে খবর বাড়িতে দেবার মত নয়।

বিদেশে নতুন জীবন আরম্ভ করেই বাবুই যখন ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে পোক্ত হয়ে উঠছে, সেই সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধল। বাবুই সঙ্গে-সঙ্গে যুদ্ধ-দপ্তরে গেল যুদ্ধের খাতায় নাম লেখাতে।

ভারতীয় দেখে তাঁরা বললেন—তোমায় ভারতীয় কন্‌টিন্‌জেণ্ট-এ যোগ দিতে হবে।

বাবুই বললে—তা হয় না। ভারতবর্ষে যদি থাকতুম ভারতীয় কন্‌-টিন্‌জেণ্টেই ঢুকতুম। এখান থেকে যখন যোগ দিচ্ছি তখন সায়েবদের সঙ্গেই একসঙ্গে লড়ব। প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে যুদ্ধে নামছি, সেখানে আবার শাদা কালো কি ? রংয়ের ভেদাভেদ কিসের ? একই মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে তো সবাই মরবো !

কিন্তু বাবুইয়ের যুক্তি কর্তারা শুনলেন না। বাবুই ঈস্ট এণ্ড-এ ফিরে গেল।

তারপর এক বছর কেটে গেল যুদ্ধের। বিজয়ী জার্মাণ একের পর এক দেশ দখল করে এইবার ইংলণ্ডের দিকে নজর দিলে। জার্মাণীর বিরাট বিমান বাহিনী ইংলণ্ডকে ছেঁকে ধরে তাকে ধূলিসাৎ করবার ভয় দেখাতে লাগল। সে সময় ইংলণ্ডের রয়াল এয়ার ফোর্সকে সুগঠিত সুদৃঢ় করার জন্যে, হিটলারের আকাশ বাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্যে অক্লান্তভাবে পাইলট নেওয়া হচ্ছে আর তাদের ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে।

বাবুই গেল রয়াল এয়ার ফোর্সের দরজায়।

তাঁরা বললেন—তুমি কোথায় থাকো ? কি কাজ করো ?

বাবুই বললে—ঈষ্ট এণ্ড্। জাহাজী কুলি।

—জাহাজী কুলি, তার উপর ভারতীয় ? জানো, উড়োজাহাজের পাইলট হতে গেলে যথেষ্ট লেখাপড়া জানা দরকার ?

—আমার জানা আছে। কলকাতার য়ুনিভার্সিটির ডিগ্রী আছে আমার।

—দেখি ডিগ্রী ?

এ প্রশ্ন ও তার উত্তরের জন্যে বাবুই প্রস্তুত ছিল।

সে বললে—আমি যে-ভাবে দেশ থেকে এখানে এসেছি তাতে করে আমার পক্ষে ঐ সব কাগজ-পত্র সঙ্গে আনার উপায় ছিল না। আমার নাম, রেজিষ্ট্রেশান নম্বর ইত্যাদি দিচ্ছি, আপনারা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে খোঁজ নিন। আমাদের ইণ্ডিয়া হাউস্ই এ খোঁজ এনে দিতে পারবে।

—বেশ দেখাও তোমার পাস্‌পোর্ট, তোমার নাম টুকে নেব।

এটার জন্যে বাবুই প্রস্তুত ছিল না। তার পাস্‌পোর্ট ছিল জাল। নিজের নামই বদলে ফেলেছিল। কিন্তু সে ঘাবড়ালো না। বলল সত্যি কথা। জানালো যে কাকার টাকায় যাতে বিলেতে আসতে না হয় সেই জন্যেই এই পন্থা গ্রহণ করেছে।

রয়াল এয়ার ফোর্সের অফিসারটি সব শুনে বললেন—এর পর বুঝতেই পারছ পুলিস ডেকে তোমাকে ধরিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোনো পথ নেই। জাল পাস্‌পোর্টের জন্যে খুব সম্ভব তোমার জেল হবে। তবে তোমার নাম ও রেজিষ্ট্রেশান নম্বর টুকে রাখলুম। জেল থেকে খালাস পেলে তোমায় নিয়ে কি করা যায় ভাবা যাবে। পরে দেখা কোরো।

এই বলে তিনি বাবুইকে পুলিসের হাতে সঁপে দিলেন। যথারীতি বাবুইয়ের এক মাস জেল আর সাড়ে চার পাউণ্ড জরিমানা হল।

জেল থেকে ছাড়া পেয়েই বাবুই ছুটল রয়াল এয়ার ফোর্স্‌এর আপিসে। সেখানে গিয়ে দেখল সেই সুদক্ষ অফিসারটি ইতিমধ্যেই কেব্‌ল্ করে তার বিষয়ে সব খবর আনিয়ে নিয়েছেন এবং বাবুই সরকারের নামে নীল কাপড়ের মলাট মোড়া ঝক্‌ঝকে একখানা পাস্‌পোর্ট তাঁর টেবিলে রাখা।

অফিসারটি সেই পাস্‌পোর্ট'টি বাবুইয়ের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন —দশ শিলিং প্লাজ্‌।

জরিমানা দেবার পর বাবুইয়ের পকেট প্রায় খালি। তা হলেও কুড়িয়ে বাড়িয়ে দশটা শিলিং যোগাড় হল।

এইবার তার রয়াল এয়ার ফোর্সে ভর্তি হবার পালা। বাবুই দেখে খুশী হল যে এয়ার ফোর্সে আর্মির মত অমন চামড়ার রং সম্বন্ধে সচেতনতা নেই। অথবা এমনও হতে পারে যে সেদিনকার ইমার-জেন্সিতে চামড়ার রংয়ের দিকে মন দেবার কারো সময় ছিল না।

বাবুইকে ট্রেনিংয়ে পাঠানো হল। প্রথম দিকটা তো শুধু লেখা-পড়া। পদার্থ বিদ্যা, জ্যামিতি, ড্রয়িং, এয়ারোষ্ট্যাটিক্স্‌, এয়ারোডিনামিক্স, আর ড্রিল। শিক্ষাব ফাঁকে ফাঁকে বাবুইয়ের মনে পড়ে যেতো তার দমদমার সেই অ্যাড্‌ভেঞ্চারের কথা। যেদিন সে দড়ি হাতে উড়োজাহাজের ল্যাজে ফাঁস দিতে গিয়েছিল। এতদিনে সে বুঝতে পারল ঐ ভাবে কোনোরকমেই আকাশে ওড়া যেতে পারত না। যাই হোক, তার আকাশে ওড়ার কল্পনা যে এতদিনে বাস্তব হতে চলেছে এতে তার আনন্দের অবধি ছিল না।

বাবুই দেখতে দেখতে বেশ ভালো পাইলট হয়ে উঠল। এইবার শত্রু-শিবিরে জার্মাণীর উপরে যাত্রা করতে হয়। প্রশ্ন উঠল, তাকে ফাইটার প্লেনে দেওয়া হবে না বম্‌বারে দেওয়া হবে? ফাইটার দ্রুত গতিশালী ছোট ছোট প্লেন—শত্রুর নভচারী আক্রমণকে বাধা দেবার জন্যে। বম্‌বার বড় বড় ভাবি প্লেন। এক গুচ্ছ ফাইটারের দ্বারা সংরক্ষিত হয়ে গম্ভীরভাবে শত্রুর দেশের উপর বোমা বর্ষণ করে আসে। বাবুইয়ের শখ ছিল বিদ্যুতগতিসম্পন্ন ফাইটার প্লেন চালানো। কিন্তু স্থির হল তাকে বম্‌বারেই দেওয়া হবে। আবার ট্রেনিং। আবার ট্রেনিং।

অবশেষে বাবুইয়ের শিক্ষা সম্পূর্ণ হল।

বম্‌বার নিয়ে তার প্রথম যাত্রার কথা আজও মনে আছে। বাবুই অধীর হয়ে উঠেছিল। থেকে থেকে জিজ্ঞেস করছিল—এখনও কি সময় হয়নি? সে উত্তর পেতনা। আরো অধৈর্য হয়ে উঠত। কবে যাবো আমি?

অবশেষে তাকে বলা হল—এ প্রশ্ন এয়ার ফোর্সে কেউ করে না। পাইলটদের ক্লাব আছে, যাও সেখানে গিয়ে বিলিয়ার্ড খেল, তাস খেল, আড্ডা দাও, ফুর্ত্তি কর। যখন দরকার হবে খবর পাবে।

খবর তারপর হঠাৎই এল। এক ঘণ্টার মধ্যে প্রস্তুতি। পাইলটের পোশাক পরে বম্‌বারে গিয়ে উঠল বাবুই। সঙ্গে আরও চারজন ক্রু, সবাই ইংরেজ। রয়াল এয়ার ফোর্সে ভারতীয় খুব কমই ছিল।

এদের হাতে ম্যাপ দেওয়া ছিল। ম্যাপ দেখে বাবুই বুঝলে তাদের উত্তর সমুদ্র তীরবর্ত্তী হামবুর্গে যেতে হবে। গভীর রাত, কুয়াশাচ্ছন্ন অন্ধকার শীতল আকাশ। সঙ্গে সজাগ রক্ষী ছ-টি আর-এ-এফ্ ফাইটার। অন্ধকারের মধ্যে ঠিক কখন ইংলিশ চ্যানেল, উত্তর সাগর, ডেনমার্কের মাটি পেরিয়ে গেছে টের পায়নি। পায়ের তলায় সমস্তই তো অন্ধকার —নিশ্ছিদ্র ব্ল্যাক্ আউট। টের পেল যখন অ্যান্টি-এয়ারক্রাফ্‌টের গোলাগুলো উঠে এসে আকাশে ফাটতে লাগল। বাবুইরা বুঝল ওরা জার্মানির উপকূলে এসে পৌঁচেছে; এইবার টার্গেট খুঁজে বার করা। সব রকম নির্দেশ দেওয়া ছিল তাদের। সেই অনুসারে এসে পড়ল তারা টার্গেটের উপর। তখন তাদের ঘিরে সে কী অ্যান্টি-এয়ারক্রাফ্‌টের গোলার বিস্ফোরণ! তার সঙ্গে এগিয়ে এল এক ঝাঁক জার্মান ফাইটার। সেবারে আকাশ যুদ্ধে বাবুইদের দুটি ফাইটার জখম হয়ে ঘুরতে ঘুরতে অন্ধকারের মধ্যে তলিয়ে গিয়েছিল। জার্মানদের ফাইটার পড়েছিল কিনা জানা নেই। কিন্তু বাবুইদের বম্‌বার হামবুর্গের উপর প্রচুর বোমা ফেলে অক্ষত দেহে ফিরে এসেছিল ইংলণ্ডে।

এইভাবে চললো বাবুইয়ের যুদ্ধের অভিজ্ঞতা। বাবুই বম্‌বার নিয়ে অন্ধকারে জার্মানির উপর যেত আর ফিরে এসে বলত—আজ কলোন্ জ্বালিয়ে এলুম। আজ এরফুর্ট জ্বালিয়ে এলুম। আজ ড্যুসবুর্গ, আজ ড্যুসেলডর্ফ, আজ এস্‌সেন জ্বালিয়ে এলুম। আজ জ্বালিয়ে এলুম বের্লিন।

শেষে একদিন আর সে ফিরে এল না। রয়াল এয়ার ফোর্সে যোগদান করেই সে বাড়িতে চিঠি লিখেছিল। বিলেতে এসে সেই তার প্রথম চিঠি। তার পর যতদিন সে নভোযুদ্ধ করেছে, নিয়মিত ভাবে

তার মাকে চিঠি লিখেছে। হঠাৎ চিঠি পাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। দু-তিন হপ্তা ফাঁক যাওয়ার পর মা একদিন আর্ এ-এফ্-থেকে খবর পেলেন, বাবুইয়ের প্লেন জার্মানীর উপরে গিয়ে আর ফেরেনি। খুব সম্ভব অ্যান্টি-এয়ারক্রাফ্টের গুলিতে নস্ট হয়ে গেছে। কোনো কোনো পাইলট প্যারাশুটে করে লাফিয়ে পড়বার জন্যে প্রস্তুত হয়েছিল এটুকু সংবাদ রেডিও মারফত পাওয়া গিয়েছিল। এর থেকে বোঝা গেলনা বাবুই বেঁচে আছে কি মারা গেছে।

বহুদিন উদ্বেগে কাটবার পর তার মা প্রায় দশমাস পরে রেড ক্রসের কাছ থেকে খবর পেলেন যে তাঁর ছেলে জার্মানীতে বন্দী।

যুদ্ধ শেষ হওয়া অবধি বাবুইয়ের বন্দীদশায় কাটল। তারপর সে ছাড়া পেল।

যুদ্ধ-জীবন তো শেষ হল প্রচুর অ্যাড্ভেঞ্চারের মধ্যে দিয়ে। এইবার সে কি করবে? হয়তো দেশে ফিরতে হবে। কিন্তু দেশে ফিরে সে করবে কি? কাকার আশ্রয়ে থাকার তার একরত্তি ইচ্ছে নেই। নিজের পায়ে যে দাঁড়াবে কি তার সম্বল? শিখেছে তো আকাশে বম্বার ওড়ানো। যুদ্ধ-শেষে কে তাকে দিয়ে বম্বার উড়িয়ে মোটা মাইনে দেবে?

জার্মানীতে বন্দী-শিবিরে থাকতে বাবুইয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল একজন সুইস্ ব্যবসায়ীর। তিনিও বন্দী। নাম মিঃ হেবার। ইনি যুদ্ধের আগে শুক্তির মধ্যে মুক্তো কাল্চার করতেন। প্রশান্ত মহাসাগরের ছোট এক দ্বীপের গায়ে এঁর পার্ল ফিশারি ছিল—সেখানে ইনি মুক্তোর চাষ করতেন। জাপান যুদ্ধে নামবার পরই প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চল বিপৎপূর্ণ হয়ে ওঠে। ব্যবসা গুটিয়ে তাঁকে চলে আসতে হয়। সুইজারলাণ্ড বিশ্বযুদ্ধে নিরপেক্ষ ছিল, কাজেই এঁর যুদ্ধে নামবার কোনো আবশ্যকতা ছিল না। কিন্তু ইনি মনে মনে ঘোর নাৎসি-বিরোধী ছিলেন বলে ভলান্টিয়ার হয়ে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। বাবুই শুনেছিল তার বাবার চাষ-করা মুক্তো-ব্যবসায়ের ইতিহাস। শুনেছিল কী শোচনীয় ভাবে তিনি বঞ্চিত হয়েছিলেন। সেই থেকে তার অবচেতন মনে মুক্তো চাষের একটা জিজ্ঞাসা সব সময় লুকিয়ে থাকত। মিঃ

হেবারের সংস্পর্শে এসে সে অনেক সুযোগ পেল এই নিয়ে আলোচনা করবার, এর বিষয়ে জানবার। শেষে মিঃ হেবার যখন বললেন, এবার তিনি প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে যাবেন আবার তাঁর শুক্তির চাষকে গড়ে তোলবার জন্যে, তখন বাবুই বললে—আমাকেও সঙ্গে নিন।

বাবুইকে তিনি নিরাশ করলেন না।

শুরু হল বাবুইয়ের মুক্তো চাষের অভিজ্ঞতা। হেবারের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সে সামান্য চাকুরে হয়ে ঢুকে পাঁচ বছরের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার হল। তখন তার বয়েস ত্রিশ। সে সময় সে তার মা-কে কাকা-কাকিমাকে প্রায়ই মুক্তোর নানারকম জিনিস উপহার পাঠাতো। মা বিধবা মানুষ, মুক্তো নিয়ে কি করবেন, বাবুইয়ের ভবিষ্যৎ বৌয়ের জন্যে তুলে রেখে দিতেন।

ম্যানেজার হবার পর বাবুই হেবারের ব্যবসার অংশীদার হয়। তাদের প্রতিষ্ঠানের মুক্তো পৃথিবীর প্রায় সব দেশে যেতো এবং প্রচুর লাভে বিক্রী হত। মোট কথা আরো দশ বছরের মধ্যে বাবুই বেশ রীতিমত বড়লোক হয়ে পড়ল। বাবুয়ের বয়েস হল চল্লিশ।

তখন আর মুক্তো চাষের মধ্যে কোনো অ্যাড্‌ভেঞ্চার নেই। সমস্ত জিনিসটাই রুটিন বাঁধা পুরোনো হয়ে গেছে। শুধু ঘরে আসছে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা। প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপে নোনা জলের ধারে বসে কেবল টাকা কুড়িয়ে সে আর কি করবে? যথেষ্ট তো হয়েছে। বাবুইয়ের আর ভালো লাগলনা। এইবার দেশের দিকে মন টানল। অ্যাড্‌ভেঞ্চারই যদি ফুরিয়ে থাকে তাহলে দেশে ফেরাই ভাল। তা ছাড়া দেশটা স্বাধীন হয়ে কেমন তার চেহারা হল সেটাও দেখা দরকার। সে তার অংশ বেচে দিয়ে লাভের কড়ি নিয়ে কলকাতায় ফিরে এল।

আঠারো বছর বয়সে দেশ ছেড়েছিল। চল্লিশ বছরে ফিরল। এর প্রতিটি দিন তীব্র অভিজ্ঞতায় ভরা। বাবুইয়ের অ্যাড্‌ভেঞ্চারের তৃষ্ণা মিটেছে। এবার সে চায় শান্তভাবে বসে জীবন কাটাতে। জীবনের এ দিকটাও তো দেখতে হবে। বাবুই সেদিন বলছিল—সে যেন এক জাহাজের কাপ্তেন—প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে ।দয়ে অপার সমুদ্রে তার জাহাজকে চালিয়ে নিয়ে চলেছিল, পাহাড় প্রমাণ তরঙ্গের পর তরঙ্গ ভেঙে

দোল খেতে খেতে। তবু ঝড় তো চিরদিনের নয়। এখন সে পৌঁছেছে ঝড়ের ওপারে। আকাশ নিঃশব্দ নির্মেঘ, বাতাস স্থির অচঞ্চল। নিস্তরঙ্গ নীল জল কেটে কেটে যেন কাঁচের উপর দিয়ে মসৃণ গতিতে চলেছে এবার তার তরী। এ-ও এক অভিজ্ঞতা।

এত অভিজ্ঞতার পরও বাবুই কিন্তু তার পুরোনো জীবনকে ভোলে-নি। কেন না, দেশে ফিরে প্রথমেই সে আজব-তত্ত্বের খোঁজ করে ছিল। হায়, বাবুইয়ের প্রিয় কাগজ আজব-তত্ত্ব আর নেই। কবে বন্ধ হয়ে গেছে! পুরোনো সংখ্যাগুলো পর্যন্ত কোনো লাইব্রেরীতেও আর খুঁজে পাওয়া যায় না। বাবুই আজকাল দেশ বিদেশের বই পড়ে, অ্যাড্‌ভেঞ্চারের বই পড়ে, কিন্তু প্রায়ই বলে—আঃ, ছেলেবেলাকার সেই কাগজটা যদি পাওয়া যেত, একেবারে দৌড়ে ছাদে উঠে পাঁচিলের কোণে ছায়ায় বসে পা ছড়িয়ে পড়তে লেগে যেতুম।

ছেলেবেলায় ফিরে গিয়ে ছাদের কোণটিতে বসে আজব-তত্ত্ব কোলে নিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে বিভোর হয়ে যাওয়ার স্বপ্ন এখনও সে দেখে।

BABUER ADVENTURE By MOHANLAL GANGULI *